আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ

(Evolution of Arabic Rhetoric during Abbasi Period)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত)

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নো'মানী

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

আতাউর রহমান শাহান

এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ নং ৭/২০১৪-২০১৫

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ডিসেম্বর, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব আতাউর রহমান শাহান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত **"আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য অভিসন্দর্ভটি সন্তোষজনক। আমি এ অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নো'মানী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমি সম্পূর্ণরূপে বা এর কোন অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশনার জন্য বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

(আতাউর রহমান শাহান)
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ৭/২০১৪-২০১৫
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপার করুণা ও মেহেরবানীতে **"আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, মানবতার বন্ধু, করুণার সিন্ধু, আশরাফুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে মানুষ তার স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী স্যারের প্রতি, যিনি একজন প্রকৃত গবেষক, গবেষণা যাঁর নেশা। তিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহসহ সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করেছেন। ফলে আমার এ গবেষণা কর্মটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউছুফ স্যারের প্রতি, যিনি আমার থিসিস সম্পাদন করা এবং জমা দেয়া পর্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। এ গবেষণাকর্মে তাঁর সৃজনশীল দিকনির্দেশনা আমাকে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি, যিনি এ অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্বাচন এবং সম্পাদন সম্পন্ন করতে আমাকে সদা-সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, বিশেষত, অধ্যাপক ড. মো: আবু বকর সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, সহকারী অধ্যাপক ড. বেলাল হোসাইন,

Dhaka University Institutional Repository

সহকারী অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান শামীম প্রমুখের প্রতি, তাঁদের উৎসাহ আমাকে অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে উদ্দীপ্ত করেছে।

এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম মমতাময়ী মা বেগম শামছুন নাহার ও পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মাওলানা আব্দুর রহিমকে, যাঁদের অশ্রু ও দু'আ আমার সকল সফলতার নিয়ামক, যাঁদের দু'আ আমার জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে পাথেয় হিসেবে কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু দান করুন এবং আমাকে নিয়ে তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেন আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করুন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি, বিশেষকরে আমার অগ্রজদ্বয় মো: মাহবুবুর রহমান পাভেল, মো: আজিজুর রহমান কামালকে-যাঁরা বার বার তাগিদ দিয়ে অভিসন্দর্ভের কাজকে তরান্বিত করেছেন।

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার সহধর্মিনী মাসুদা আক্তারকে, যিনি সার্বিকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার কলিজার টুকরা মাহমুদা আমাতুল্লাহ সারাকে, গবেষণাকর্ম চলাকালীন তাকে স্নেহ-ভালবাসা থেকে কত যে বঞ্চিত করেছি তার ইয়াত্তা নেই।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতি, যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। এছাড়া যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সব লেখকের অবদানও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব আবুল আতিক মোঃ শফিকুল ইসলামকে যিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে এ অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে আমাকে সহায়তা করেছেন। আরো যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক

মোবারকবাদ। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

গবেষক

আতাউর রহমান শাহান

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আল-কুরআন, ৩০ : ১৫	: প্রথম সংখ্যা সুরাহর আর দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
ই. ফা. বা.	: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ইবি	: ইসলামী বিশ্বকোষ
সা.	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	: আলাইহিস সালাম
রা.	: রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
রহ.	: রহমাতুল্লাহি আলাইহি
হি.	: হিজরী
খ্রি.	: খ্রিস্টাব্দ
বাং	: বাংলা
জ.	: জন্ম
মৃ.	: মৃত্যু
পৃ.	: পৃষ্ঠা
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
সং	: সংস্করণ
খ.	: খণ্ড
ড.	: ডক্টর
অনু.	: অনুবাদ বা অনুবাদক
সং	: সংস্করণ/ সংখ্যা
বং	: বঙ্গাব্দ
তা. বি.	: তারিখ বিহীন

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালা (الحروف الهجائية العربية) এর বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র অভিসন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا=ء	উর্ধ্ব কমা’	ز	যা	ق	ক্বা
ب	বা	س	ছা	ك	কা
ت	তা	ش	শা	ل	লা
ث	ছা	ص	সা	م	মা
ج	জ্বা	ض	দ্বা	ن	না
ح	হা	ط	ত্বা	و	ওয়া
خ	খা	ظ	জা	ه	হা/হ্
د	দা	ع	‘আ	ي	ইয়া/য়া
ذ	যা	غ	গা/ঘা		
ر	রা	ف	ফা		

সূচীপত্র

ভূমিকা.....০১-০২

প্রথম অধ্যায়: আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র পরিচিতি.....০৩-৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ: **আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিচয়** ০৪-১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: **আরবী অলঙ্কার ও ভাষার বিশুদ্ধতা** ১৯-৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.....৩৪-৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ: জাহিলী: যুগ পরিচয় ও পরিধি ৩৫-৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জাহিলী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র.....৩৭-৬৭

তৃতীয় অধ্যায়: আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ: ইসলামী যুগ..... ৬৮-৮৮

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামী যুগ: পরিচয় ও পরিধি ৬৯-৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনুল কারীম ও ইলমুল বালাগাত ৭০-৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূল (সা.) এর হাদীস ও আরবী অলঙ্কার ৮৬-৮৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইসলামী যুগে আরবী অলঙ্কারপূর্ণ কাব্য সাধনা.....৮৮-৮৯

চতুর্থ অধ্যায়: উমাইয়া যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র.....৯২-১০৮

প্রথম পরিচ্ছেদ: উমাইয়া যুগ: পরিচয় ও পরিধি.....৯৩-৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ায়ইামউ যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ.....৯৫-১০৮

পঞ্চম অধ্যায়: আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ ১০৯-১৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ: আব্বাসী যুগ: পরিচয় ও পরিধি.....১১০-১১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ.....১১২-১৩৬

উপসংহার.....১৩৭-১৩৮

গ্রন্থপঞ্জি.....১৩৯-১৪১

ভূমিকা

যে নিয়মাবলী অনুসরণ করলে মনের ভাব ও মর্ম শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগী রূপে প্রকাশ করা যায় সেই নিয়মাবলী জানাকে علم البلاغة বা অলঙ্কার শাস্ত্র বলে। আরবী ব্যাকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র হচ্ছে অলঙ্কার শাস্ত্র। এটি বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত শাস্ত্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বহু মনীষীর বহু বছরের সাধনার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রটি আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। জাহিলী যুগে এর বীজ বপন করা হয় অতঃপর ক্রমান্বয়ে তা পূর্ণতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। পবিত্র কুরআন অবতরণের আগেই আরবরা কাব্য রচনায় পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং এ ক্ষেত্রে তারা চরম উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়। এমনকি গোটা জাতি কাব্যপ্রেমী জাতিতে পরিণত হয়। কবিতা হয়ে ওঠে তাদের জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। এমনি এক মুহূর্তে অবতীর্ণ হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম। আল-কুরআনের ভাষাগত শৈল্পিক সৌন্দর্য অবলোকন করে সাহিত্যামোদী আরবজাতি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় এমনকি পবিত্র কুরআনের একটি ছোট্ট সুরাহ তৈরির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে তারা অপারগ হয়ে যায়। শাশ্বত ও চিরন্তণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্যের প্রভাবে গোটা আরবী সাহিত্য নতুনরূপে পদার্পণ করে। পবিত্র কুরআনকে আশ্রয় করে আরবী ব্যকরণের শাস্ত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রও আরবী ব্যকরণের অন্যতম আবশ্যকীয় শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর জন্য আব্বাসী যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়েছে। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রও আব্বাসী যুগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় কোনো গবেষণা হয়নি। অতএব, এটা সময়ের দাবি যে, 'আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ' নিয়ে গবেষণা হওয়া। এরই প্রেক্ষিতে এ গবেষণাকর্মটি প্রণিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত:

প্রথম অধ্যায়ে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিচয় এবং বালাগাত ও ফাসাহাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে জাহিলী যুগের আরবী অলঙ্কার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিকর্ম সম্পর্কেও এ অধ্যায় থেকে পাঠক একটি ধারনা নিতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস ও আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র এবং এ যুগের খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে অবদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে উমাইয়া যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ ও এ ক্ষেত্রে এ যুগের আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ যুগের আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অতঃপর উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি প্রদানপূর্বক এ অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা, এ গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে আরবী বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের নিকট **"আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ"** সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে যা এত দিন আমাদের নিকট প্রায় অজানা ছিল। আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, মানবীয় স্বভাবজাত ভুল-ত্রুটি এবং গবেষণার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান সত্ত্বেও এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের দ্বারা পাঠকগণ সামান্যতম উপকৃত হলে নিজের শ্রম সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। মহান আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ
আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিচয়

علم البلاغة আরবী ব্যাকরণের একটি শাখা বা শাস্ত্র।[১] আরবী ভাষা সম্পর্কিত এরকম প্রধান শাস্ত্রের সংখ্যা পাঁচটি। যথা:

علم الصرف-এর সম্পর্ক হলো শব্দ কাঠামোর সাথে।

علم النحو-এর সম্পর্ক হলো বাক্য কাঠামোর সাথে।

علم الإملاء-এর সম্পর্ক হলো হস্তলিপির সাথে।

علم العروض-এর সম্পর্ক হলো কবিতা ও ছন্দের সাথে।

علم البلاغة-এর সম্পর্ক হলো ভাব ও মনের সুন্দর ও সঠিক প্রকাশের সাথে।[২]

علم البلاغةএর আভিধানিক পরিচয়

১. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান* (রাজশাহী: সাফিউল্লাহ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১
২. আবু তাহের মেসবাহ, *আততারীকু ইলাল বালাগাহ* (ঢাকা: দারুল কলম, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১

علم البلاغة একটি যৌগিক শব্দ। এর প্রথমটি علم , এটি একটি মাসদার। এর মূল অক্ষর ع+ل+م । জীনস হচ্ছে সহীহ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, তত্ত্ব, তথ্য, শাস্ত্র ইত্যাদি।[৩] দ্বিতীয়টি البلاغة এর মূল অক্ষর غ+ل+ب। এর জীনস সহীহ। অর্থ পৌঁছা, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা, উপনীত হওয়া ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শব্দটি এসেছে। যেমন:

حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة

علم البلاغة এর পরিভাষিক পরিচয়

علم البلاغة বা আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রফেসর ড.মু. নকিবুল্লাহ বলেন, علم البلاغة এমন এক প্রকার বিদ্যা যা অর্জন করলে বক্তা তার মনের ভাব অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী শ্রোতার নিকট বিশুদ্ধ ভাষায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়।[৪]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, "যে নিয়মাবলী অনুসরণ করলে মনের ভাব ও মর্ম শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগীরূপে প্রকাশ করা যায় সেই নিয়মাবলী জানাকে علم البلاغة বলে।"[৫]

আল্লামা হাফনী নাসিফ বেগ বালাগাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, علم البلاغةهي بقواعد لم يقع الخطأ في التكلم بمقتضى الحال برعايتها- "বালাগাত এমন এক বিদ্যার

৩. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৪. প্রাগুক্ত
৫. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

নাম যা অবগত হলে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াই অবস্থার চাহিদানুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়।"[৬]

আল্লামা সা'দউদ্দীন তাফতাজানীর মতে, "البلاغةهي تنبئ عن الوصول والانتهاء

"বক্তার বক্তব্য তার শেষ প্রান্তে উপনীতে হওয়াকে البلاغة বলে।"[৭]

আর-রুমানী বলেন, البلاغة هي إيصال المعنى الى القلب في أحسن صورة من اللفظ

"বালাগাত হচ্ছে শব্দ যা অর্থকে সুন্দর আকৃতিতে হৃদয়ে পৌঁছে দেয়।"[৮]

ড. মু, নকিবুল্লাহ তাঁর আরবী অলঙ্কার বিজ্ঞান গ্রন্থে প্রাচীন আধুনিক ও পাশ্চাত্য অলঙ্কার বিদদের বেশ কিছু সংজ্ঞা উপস্থাপন করে এ বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য অলঙ্কারবিদদের নিকট বালাগাত কখন যোগ্যতা (ملكة), কখন বিষয় (فن), কখন উপাখ্যান (قصة), আবার কখন বিদ্যা (علم) হিসেবে বিবেচিত। যদি আমরা প্রাচীন ও আধুনিক অলঙ্কারবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞার তুলনা করি, তবে এটি বালাগাতের বিবেচনায় একটি উত্তম পদ্ধতি এবং অনুকুল অর্থসহ পাঠকের অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে। আর যদি শুধু আধুনিক যুগে প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে তুলনা করি, তবে আমরা আধুনিক আরবীর উপর পাশ্চাত্যদের সংজ্ঞার প্রভাব দেখতে পাই।"[৯]

নামকরণের কারণ

---

৬. হাফনী বেগ নাসিফ, অনু. মাহমুদ হাসান কাসেমী ও আবুল কালাম মাসুম, *দুরুসুল বালাগাত* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৮

৭. মাসউদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, অনু. মুহাম্মদ আবূ বকর কাসেমী, *মুখতাসারুল মা'আনী* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৯১

৮. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

علم البلاغة এর অর্থ হচ্ছে অলঙ্কার বিষয়ক বিদ্যা বা শাস্ত্র যথা স্থানে বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিদ্যা। যেহেতু এ শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার বক্তব্যের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে সেহেতু এ শাস্ত্রকে علم البلاغة নামে নামকরণ করা হয়েছে।[১০]

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচ্যবিষয়

অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, الألفاظ العربية ومعانيها "আরবী শব্দাবলী এবং তার অর্থ সমূহ।"[১১]

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচ্যবিষয়

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপত্তির মূল উদ্দেশ্য হলো বক্তব্যকে স্পষ্ট করা, সুন্দরভাবে অতিকতর বোধগম্য পর্যায়ে উপস্থাপন করা। এদিকে লক্ষ্য করেই বক্তা তার বক্তব্যে অলঙ্কার বা বালাগাত প্রয়োগ করে। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রাচীন আরব কবিগণ তাঁদের বক্তব্য তথা কাব্যকে স্পষ্ট ও রসোত্তীর্ণ করার মানসে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন যেমন, তারা تشبيه، كناية، مجاز، إستعارة প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগ করতেন। এতে করে তাঁদের বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্কার হতো– শ্রোতা খুব সহজেই বুঝতে সক্ষম হতো। পরবর্তীকালের কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট, মানসম্পন্ন ও শৈল্পিক করার মানসে বালাগাত বা অলঙ্কার বাক্যে প্রয়োগ করতে থাকেন। এ ধারাবাহিকতা বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ড. মু.নকিবুল্লাহ আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

---

১০. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১১. প্রাগুক্ত

১. শৈল্পিক উদ্দেশ্য

২. ধর্মীয় উদ্দেশ্য

শৈল্পিক উদ্দেশ্য

কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় শিল্পকলার বহিপ্রকাশ ঘটানোর মানসে বাক্যে বিভিন্ন অলঙ্কার প্রয়োগ করে থাকেন। এর ফলে উত্তম বক্তব্য নিকৃষ্ট বক্তব্য থেকে আলাদা হয়ে যায়। আর এ জাতীয় বিচার বিশ্লেষণের নিমিত্তে إبن طبا طبا রচনা করেন عيار الشعر আর প্রখ্যাত আরবী অলঙ্কারবিদ قدامة بن جعفر প্রণয়ন করেন نقد الشعر এর মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।[১২]

শৈল্পিক উদ্দেশ্য

আল-কুরআনুল কারীম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ। এটি মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিনের প্রত্যাদিষ্ট কিতাব। এ গ্রন্থে ব্যবহৃত বালাগাত, ফাসাহাত, বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, শব্দের মাধুর্যতা, সহজবোধ্যতা ও সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি এবং অসাধারণ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, উদাহরণ, ভবিষ্যদ্বানী, ইতিহাস প্রভৃতির অনন্য সাধারণ বর্ণনা গোটা আরব জাতিকে হতভম্ভ করে দেয়। পবিত্র কুরআনে আরব জাতির উপর চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেয়া হয়, যে চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এ উদ্দেশ্যকে সমানে নিয়ে অনেকেই গ্রন্থ প্রনয়ণে এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে আল-বাকিল্লানী, আর-রুমানী, আয-যামাখশারীর নাম প্রণিধানযোগ্য।[১৩]

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

---

১২. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এ মহাগ্রন্থ সেই সময়ে অবতীর্ণ হয় যখন গোটা আরব জাতি আরবী কাব্যের ঝঙ্কারে বিমোহিত। আরবী পদ্য সাহিত্য তখন চরম উৎকর্ষের যুগ অতিক্রম করছে। অনন্য সাধারণ শৈল্পিক সৌন্দর্যে বিকশিতআল-কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহিত্যামোদী আরব জাতি হতবিহবল হয়ে যায়। আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষের যুগে অবতীর্ণ কিতাবের নিকট আরব জাতির অক্ষমতা তাদেরকে নিরুপায় করে দেয়। অনেকেই পবিত্র কুরআনের শৈল্পিকতার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এমন বহু ঘটনা রয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের অমীয় বাণী শুনে অনেকে শাশ্বত ও চিরন্তন সুমহান আদর্শ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), কবি তুফাইল ইব্ন আমর দাওসী (রা.) প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া মহানবী (স.)-এর চিরশত্রু আবু জাহল, উকবা, আখনাস ইব্ন শুরাইক প্রমূখ দূরাচার পবিত্র কুরআনের আকর্ষণে মহানবী (সা.)-এর বাড়ির চারপাশে গভীর রাত্রিতে অবস্থান করতো এবং পবিত্র কুরআন শ্রবণ করতো। কিন্তু এরাই দিনের বেলায় পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার প্রাণান্ত চেষ্টা করতো। অন্যদিকে মহানবী (সা.) নিজেও ছিলেন আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী মানুষ। তাঁর বক্তব্যও ছিলো অনন্য সাধারণ অলঙ্কার মন্ডিত। আর কুরআনুল কারীম ও হাদীসই হচ্ছে ইসলামী শরীয়াহর মৌলিক উৎসগ্রন্থ। এ দু'টি কিতাব ভালোভাবে অধ্যয়ন করা অতীব জরুরী। কেননা, কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বোঝার মাধ্যমেই ইসলামী শরীয়াহ অনুধাবন যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সেই সাথে পবিত্র কুরআনের ভাব, ভাষা ও মর্ম এবংরাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুমহান বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে এ শাস্ত্র অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহ معجز। আর কুরআনুল কারীমের معجز হওয়া বোঝা এবং বোঝানোর জন্য আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। 'অপরদিকে

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রিসালাত প্রমাণিত হওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনের معجز হওয়া আবশ্যক। আর রাসূল (স.)-এর বিসালাত দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়। ফলে অলঙ্কার শাস্ত্র তাওহীদ ও বিসালাতের জন্য অপরিহার্য একটি শাস্ত্র।[১৪]

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উপকারিতা প্রসঙ্গে ড. মু. নকীবুল্লাহ বলেন:

"علم البلاغة (আরবী অলঙ্কার) এর উপকারিতা রয়েছে অনেক। এটি ভাষাদেহে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। বাক্যের মাধুর্যতা বাড়ায়। বাক্যে অর্থের অস্পষ্টতা দূর করে স্পষ্টতা আনয়ন করে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী علم البلاغة অধ্যয়নের নিম্নরূপ উপকারিতা বর্ণনা করেন:

ক) علم البلاغة ভাষাসৌন্দর্যের মূল উৎস আল-কুরআনের অর্থ ও তার গোপন রহস্য সহজে বুঝতে সহযোগিতা করে।

খ) علم البلاغة অধ্যয়নের মাধ্যমে সাবলীল ও সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলা এবং সুন্দর ও অসুন্দর কথার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

গ) স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[১৫]

অলঙ্কার শাস্ত্রের মর্যাদা

মর্যাদার দিক থেকে ইলমুল বালাগার স্থান শীর্ষে। সুক্ষ্মতার বিচারেও এর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র হওয়ার পক্ষে এই যুক্তি প্রদান করা হয় যে, এ শাস্ত্র রাসূলুল্লাহ (স.)-এর

১৪. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৫. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

রিসালাতের সত্যায়ন করে। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রিসালাতের সত্যায়ন ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম।[১৬]

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের শাখাসমূহ

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের শাখা ৩টি। যথা:

১.علم المعانىবা অর্থালঙ্কার

২. علم البيانবা বর্ণনাঙ্কার

৩.علم البديعবা বাক্যালঙ্কার

علم المعانى বা অর্থালঙ্কার

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান শাখা হচ্ছে علم المعانى বা অর্থালঙ্কার। এর পরিচয় দিতে গিয়ে ড. মু. নকিবুল্লাহ বলেন, "এটি এমন একটি বিদ্যা যা দ্বারা আরবী শব্দের এ অবস্থাসমূহ জানা যায়, যার মাধ্যমে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়।"[১৭]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, "যে সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করলে শব্দ বা বাক্য তথা মানুষের যাবতীয় কথা مقتضى الحال অনুযায়ী হয়, অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী হয় তাকে علم المعانى বলে।"[১৮]

দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন,

---

১৬. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৭. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
১৮. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

"ইলমুল هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التى بها يطابق مقتضى الحال মা'আনী বা অর্থালঙ্কার ঐশাস্ত্রকে বলা হয় যার দ্বারা আরবী শব্দের ঐ অবস্থাসমূহ জানা যায় যার মাধ্যমে শব্দ অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী হয়।"[১৯]

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন:

"ইলমুল هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التى بها يطابق مقتضى الحال মা'আনী হলো ঐ শাস্ত্র যার দ্বারা আরবী শব্দ সমূহের সেসব অবস্থা জানা যায়, যে সব অবস্থার প্রেক্ষিতে لفظ তথা শব্দ مقتضى الحال বা অবস্থার চাহিদার আলোকে হয়ে থাকে।[২০]

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"**وَأَنَّا لَا نَدْرِيأَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا** জমিনে বিচরণকারীদের প্রতি ক্ষতিকর কিছুর ইচ্ছা করা হয়েছে অথবা তাদের প্রভু তাদের প্রতি কল্যাণকর কিছুর ইচ্ছা পোষণ করেছেন, এটি আমাদের জানা নেই।"[২১]

ইলমুল মা'আনীর বিষয়বস্তু

ইলমুল মা'আনীর বিষয়বস্তুকে আরবী অলঙ্কারবিদগণ দু'টি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন। এক. আরবী ভাষার শব্দাবলী দুই. আরবী ভাষার বাক্যাবলী।

ইলমুল মা'আনীর উদ্দেশ্য

ইলমুল মা'আনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরবী বাক্যের যথাযথভাব এবং অর্থ প্রকাশে যাবতীয় ভুলত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা।

---

১৯ . হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২০. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
২১. আল-কুরআন, ৭২ : ১০

ইলমুল মা'আনীর অধ্যায়সমূহ

আরবী অলঙ্কারবিদগণ ইলমুল মা'আনীকে ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।[২২]

১। أحوال الإسناد والخبر

২।مسند إليه أحوال

৩।المسند أحوال

৪।متعلقات الفعلأحوال

৫। القصر

৬। الإنشاء

৭। الوصل والفصل

৮। الإيجاز والإطناب والمساواة

ইলমুল বায়ানের পরিচয়

علم البيان এর আভিধানিক পরিচয়

علم البيانযৌগিক শব্দ। এর প্রথমটি علم। এটির আলোচনা পূর্বে হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দটি البيان । البيانশব্দটির অর্থ নিম্নরূপ:

১. স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে সুস্পষ্ট ও সাবলীল কথাবার্তা ব্যক্ত করা হয়, তাকেও বায়ান বলা হয়।[২৩]

---

২২. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২৩. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২.সুষ্ঠুকরা, প্রকাশ করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী هَذَابَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

৩. প্রাঞ্জল বক্তব্য

৪. দলীল প্রমাণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ**

৫. বর্ণনা করা, প্রকাশ করা, উজ্জ্বল করা ইত্যাদি।[২৪]

যেমন- রাসূল (স.) এর বাণী: **إن** من البيان لسحرا[২৫]

"নিশ্চয় কোনো কোনো বক্তৃতায় যাদু রয়েছে"।

পারিভাষিক পরিচয়

দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থ প্রণেতার মতে,

البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية "ইলমুল বায়ান এমন একটি শাস্ত্রের নাম, যাতে তাশবীহ, মাজায ও কিনায়াহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[২৬]

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকারের মতো, " بيان ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে একটি বিষয়কে একাধিকভাবে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জিত হয় এবং উদ্দিষ্ট অর্থ বের করার ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি অন্যটির তুলনায় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হয়। এ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে তাশবীহ, কেনায়াহ, মাজায ও ইস্তি'আরা।[২৭]

---

২৪. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
২৫. সহীহ বুখারী, হা. নং-৪৮৫১
২৬. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২৭. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ.

ড. মু.নকিবুল্লাহর মতে, "ইলমুল বায়ান এমন কতকগুলো নিয়মনীতি সম্বলিত বিদ্যার নাম যা দ্বারা একটি ভাব অর্থকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক বর্ণনার পন্থা জানা যায়।[২৮]

ইলমুল বায়ানের আলোচ্য বিষয়

শব্দাবলী এবং শব্দাবলী দ্বারা গঠিত বাক্যাবলী যেখানে মনের অভিব্যক্তি স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় معانى الكلمات حقيقة ومجاز শব্দাবলীর বাস্তব ও রূপক অর্থ।

আবু তাহের মেসবাহের মতে, "যে সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করলে একটি ভাব ও মর্মকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করা যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উদিষ্ট অর্থটি স্পষ্ট হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন হয়। যেমন- রাশিদ অতিথি পরায়ণ-এই বাক্যে উদ্দিষ্ট অর্থটি স্পষ্ট। পক্ষান্তরে রাশিদের বাড়ীতে দিন-রাত রান্না হয়- এ বাক্যে উদ্দিষ্ট অর্থটি প্রচ্ছন্ন।"[২৯] ইলমুল বায়ানে উপমা, রূপকার্থ ও ইঙ্গিতার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৩০]

ইলমুল বাদী-এর পরিচয়

এ পর্যায়ে ইলমুল বাদী'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় তুলে ধরা হবে।

ইলমুল বাদী এর আভিধানিক পরিচয়

بديع এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে-

১। الأمر الذى يفعل أولا তথা এমন কাজ যা প্রথমে করা হয়।

---

২৮. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
২৯. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২। الإنشاءبغير نمودج পূর্ব নমুনা ছাড়াই কোনো কিছু সৃষ্টি করা। মহান আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই নজীরবিহীন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁকে البديع বলা হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী-

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

৩। الحبل المفتول তথা পাকানো রশি।

ইলমুল বাদী এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, " البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال"ইলমুল বাদী এমন একটি শাস্ত্রের নাম, যার দ্বারা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বাক্যাবলীকে সুন্দর ও পরিপাটি করার পদ্ধতি জানা যায়।"[৩১]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, "যে নিয়মকানুন অনুসরণ করলে مقتضى الحال অনুযায়ী كلام এর শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়- তাকে ইলমুল বাদী বলে।"

তিনি আরো বলেন, "বালাগাতের মূল উদ্দেশ্য হলো কালাম ও কথা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী হওয়া। কালামের শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হলো পার্শ্ব বিষয়। সুতরাং ইলমুল মা'আনী ও ইলমুল বায়ান হলো মূল উদ্দেশ্য আর ইলমুল বাদী হলো পার্শ্ব উদ্দেশ্য।[৩২]

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন, 'ইলমুল বাদী এমন এক প্রকার বিদ্যা, যা দ্বারা কথা ও বাক্য যথার্থ অর্থ প্রদানসহ স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত হওয়ার পর তাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করার নানা পদ্ধতি জানা যায়।"[৩৩]

---

৩১. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩২. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩৩. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

তিনি আরো বলেন, " علم البلاغة এর তৃতীয় শাখা হলো علم البديع। বাক্যের শব্দ ও অর্থ উভয় দিকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই হলো এর মূল লক্ষ্য। শ্রোতা ও পাঠককে বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বক্তা ও লেখক ইলমুল বাদী-এর সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন। এতে শ্রোতা ও পাঠক মুগ্ধ হন। এটি এমন এক প্রকার বিদ্যা যা দ্বারা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্যকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার নিয়মাবলী জানা যায়। علم البديع বক্তব্যকে অধিক সুন্দর করে বলেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।"[৩৪]

অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "ইলমুল বাদী হলো কোন বক্তৃতা বা কথোপকথনের বাক্যাবলীকে সৌন্দর্য ও যথার্থতার সঙ্গে বিন্যাস করার এবং মনের ভাবকে অলংকৃত করে প্রকাশ করার বিদ্যা। যখন শুদ্ধ লিখিত বিবৃতি বা উক্তি অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত হয়, তখন তাকে ইলমুল বাদী নামে অভিহিত করা হয়।[৩৫]

ইলমুল বাদীর আলোচ্য বিষয়

ইলমুল বাদীর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে محسنات الكلمات العربية বা আরবী বাক্যাবলীর সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়াবলী[৩৬]

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইলমুল বাদীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরবী বাক্যসমূহকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।[৩৭]

বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মনোত্তীর্ণ বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা।[৩৮]

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৩৫. অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণ (কলিকাতা: বাণী মঞ্জিল, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৩

৩৬. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩৭. প্রাগুক্ত

ইলমুল বাদীর প্রকারভেদ

ইলমুল বাদী দুইভাগে বিভক্ত। যথা:

১. معنوي বা অর্থালঙ্কার ২. لفظي বা শব্দালংকার।[৩৯]

معنوى বা অর্থালঙ্কার

"বাক্যের যে সৌন্দর্য অর্থের সাথে সম্পৃক্ত, তাকে البديع المنوي বলে। অনেকে তাকে الصنائع المعنوية বলে অভিহিত করেছেন।"[৪০]

ড. গোলাম মাওলা বলেন, "একান্তভাবে শব্দের অর্থ রূপের আশ্রয়ে যে অলংকার গড়ে ওঠে, তাকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থালঙ্কারে অর্থই আসল শব্দ নয়।"[৪১]

لفظى বা শব্দালঙ্কার

ড. গোলাম মাওলা বলেন, "শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে অলংকার সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালংকার বলে। শব্দালংকারে শব্দই আসল, অর্থ নয়।[৪২]

ড. মু.নকিববুউল্লাহ বলেন, "বাক্যের যে সৌন্দর্য শব্দের সাথে সম্পৃক্ত তাকে البديع اللفظى বলে। অনেকে এটিকে الصنائع اللفظية বলে অভিহিত করেন।"[৪৩]

---

৩৮. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩৯. ড. মু. নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭

৪০. প্রাগুক্ত

৪১. ড. মোঃ গোলাম মাওলা, *আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙকারিক বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৯০

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصاحة والبلاغة আরবী অলঙ্কার ও ভাষার বিশুদ্ধতা

আরবী অলঙ্কারের সাথে ভাষার বিশুদ্ধতার অঙ্গাঅঙ্গি সম্পর্ক। বাক্যকে অলঙ্কারপূর্ণ করতে হলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে। এজন্য আরবী অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করতে হলে فصاحة তথা ভাষার বিশুদ্ধতার আলোচনা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অরঙ্কারবিদ ড. মু. নকিবুল্লাহর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "বাক্যকে অলঙ্কারপূর্ণ করতে হলে তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে অবশ্যম্ভাবীরূপে সহীহ-শুদ্ধ ও ফাসাহাতপূর্ণ করতে হবে। এ শর্ত পূরণ হলে তবেই সেটাকে বলা হয় كلام فصيح (বিশুদ্ধ বাক্য)। আর এর সাথে সাথে বাক্যটি যদি অর্থগত দিক দিয়েও সৌন্দর্যমন্ডিত হয় তবে সেটাকে বলা হয় كلام بليغ (অলঙ্কারপূর্ণ বাক্য)। এ সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে আরবী অলঙ্কারবিদগণ بلاغة (অলঙ্কার) এর জন্য فصاحة (শব্দের বিশুদ্ধতা) কে অত্যন্ত জরুরী বলে মন্তব্য করেছেন।"[৪৪]

এ পর্যায়ে فصاحة তথা ভাষার বিশুদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হলো।

আভিধানিক পরিচয়

الفصاحة শব্দটি باب فتح এর مصدر। মূল অক্ষর ف+ ص+ ر জীনস صحيح। এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- যদি এটি باب كرم থেকে আসে তাহলে তার অর্থ হবে সুস্পষ্ট হওয়া, সুপ্রকাশ হওয়া। ভোরের আলো যখন ফুটে ওঠে এবং সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন বলা হয় افصح الصبح অর্থাৎ (ভোর ফর্সা হলো)।[৪৫]

৪৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১; আবু তাহের মেসবাহ, *আততারীকু ইলাল বালাগাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

যখন কোনো শিশু সুস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলে তখন বলা হয় افصح الصبي في منطقه (শিশুটি স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলেছে)।[৪৬]

আর শব্দটি যদি باب كرم থেকে আসে তবে তার অর্থ হবে(১) বিশুদ্ধ হওয়া (২) খাঁটি হওয়া (৩) সুভাষী হওয়া ইত্যাদি। কোনো অনারবী যখন কোনোরূপ জড়তা ছাড়া বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলে, তখন আরবা বলে- افصح الأعجمي بالعربية । পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। মুসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থণা করতে গিয়ে বলেন, "وَأَخِيهَارُونُهُوَأَفْصَحُمِنِّيلِسَانًا –আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাগ্মী, বিশুদ্ধভাষী।"[৪৭]

পারিভাষিক পরিচয়

আত-তালখীস গ্রন্থকার বলেন," الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم -এমন শব্দ যা দ্বারা শব্দ, বাক্য ও বক্তার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।"[৪৮]

ইলমুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন, "আরবী অলঙ্কার বিজ্ঞানের পরিভাষায় فصاحةশব্দটি كلمةكلام، ও متكلم এর وصف (গুণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।"[৪৯]

ড. আব্দুল আযীয আতীক বলেন, بلاغةও فصاحة এর মধ্যে عموم وخصوص ومطلق এর সম্পর্ক বিদ্যমান। فصاحة হচ্ছে عام আর بلاغة হচ্ছে خاص। তাই এভাবে বলা যেতে পারে- كل فصيح بليغ وليس كل بليغ فصيح [৫০]

৪৬. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৪৭. আল-কুরআন, ২৮ : ৩৪
৪৮. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৪৯. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৫০. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, "অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় فصاحة শব্দটি كلمة ،كلامও وصف এর متكلم বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় এবং বলা হয় كلمة فصيحة (বিশুদ্ধ শব্দ), كلام فصيح (বিশুদ্ধ বাক্য), متكلم فصيح (বিশুদ্ধভাষী)[৫১]

এ পর্যায়ে فصاحة এর উপর্যুক্ত তিনটি শাখা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হবে।

فصاحة الكلمة

فصاحة الكلمة এর সংজ্ঞায় দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, فصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة

"ফাসাহাতুল কালিমা বলা হয়, ঐ শব্দকে যা ،تنافر الحروفمخالفة القياسএবং الغرابة হতে মুক্ত থাকে।"[৫২]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, " فصاحة الكلمة অর্থ ،تنافر الحروفومخالفة القياس الغربة এই তিনটি দোষ থেকে কোন শব্দের মুক্ত হওয়া।"[৫৩]

আল্লামা নাসিফ আল-ইয়াজিযী একে الفصاحة في المفرد বলে অভিহিত করেছেন। তিনি مفرد দ্বারা অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিত না হয়ে একক শব্দকে উদ্দেশ্য করেছেন। তাঁর মতে فصاحة الكلمة হওয়ার জন্য শব্দটিকে পাঁচটি দোষ থেকে মুক্ত হতে হবে। দোষগুলো হচ্ছে الكراهة في السمع، مخالفة القياس، غرابة الاستعمال، تنافر الحروف এবং الإبهام।[৫৪]

---

৫১. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৫২. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫৩. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৫৪. মাজমুউল আদাব, পৃ. ৩-৪

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন, فصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوى "কালিমা বা শব্দের ক্ষেত্রে ফাসাহাত হচ্ছে تنافر الحروف، الغرابة، এবংمخالفة القياس اللغوىথেকে মুক্ত থাকা।"[৫৫]

تنافر الحروف(বর্ণসমূহের পরস্পর বিরোধ হওয়া)

এর পরিচয় বর্ণনায় ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন, "এটি শব্দের এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যবহৃত বর্ণের পরস্পর অসঙ্গতির কারণে শব্দ জিহ্বার উপর ভারী হয় এবং উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়।"[৫৬]

দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন, تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها অর্থাৎتنافر الحروفহচ্ছে শব্দসমূহের এমন একটি গুণ যার কারণে শব্দের উচ্চারণ এবং উক্ত শব্দ প্রয়োগে কথা বলা কষ্টকর হয়ে থাকে।"[৫৭]

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন, التنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها অর্থাৎ تنافر الحروفহলো এমন একটি সিফাত বা গুণ যা জিহ্বার জন্য শব্দটিকে কঠিন এবং উচ্চারণকে কষ্টসাধ্য করে দেয়।"[৫৮]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, "تنافر الحروف (বর্ণ গুচ্ছের অমিল) অর্থ কোন শব্দের এমন অবস্থা যা শ্রুতিকটুতা ও উচ্চারণে কঠিনতা সৃষ্টি করে।"

তিনি আরো বলেন, "শব্দ যখন تنافر الحروف থেকে মুক্ত হয় তখন তার উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর হয়। পক্ষান্তরে কোন শব্দে تنافر الحروف থাকলে তার উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু হয়। সুতরাং تنافر الحروف হলো শব্দের একটি দোষ।"[৫৯]

---

৫৫. মাসউদ ইব্‌ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৫৬. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৫৭. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫৮.মাসউদ ইব্‌ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৫৯. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

تنافر الحروف দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: ক. ভারী খ. হালকা

ভারী: শব্দ উচ্চারণ করতে জিহ্বার উপরে বেশি ভারী হওয়াকে বুঝায়। যেমন الظش (শক্ত ও অসমতল ভূমি), الهعخع (উটের চারণযোগ্য তৃণভূমি) ইত্যাদি।

হালকা: শব্দ উচ্চারণ করতে জিহ্বার উপর কম ভারী হওয়াকে বুঝায়। যেমন- النقاخ (পরিস্কার মিষ্টি পানি) النقنقة (ব্যাঙের ডাক) ইত্যাদি।

مخالفة القياس

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন, "বাক্যে কোনো শব্দ علم الصرف এর বিধান অনুযায়ী ব্যবহৃত না হওয়াকে مخالفة القياس বলে।"[৬০]

দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, مخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي অর্থাৎ مخالفة القياسহচ্ছে, শব্দ ইলমুস সরফের বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না হওয়া; এমনকি বিরোধী ব্যবহার হওয়া।"[৬১]

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন, المخالفة ان تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة أعنى على خلاف ما ثبت عن الواضع

"মুখালাফাত বলা হয় শব্দটি অর্থবোধ একক শব্দাবলীর ব্যবহারিক নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া। অর্থাৎ শব্দের واضع তথা গঠনকারী থেকে যেরূপ বর্ণিত তার বিপরীত হওয়া।"[৬২]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, مخالفة القياس অর্থ কোন শব্দ صرف এর নিয়ম বহির্ভুত হওয়া।"[৬৩]

---

৬০. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৬১. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৬২. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

الغرابة (অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা)

ড. মু. নকিবুল্লাহ এর সংজ্ঞায় বলেন, "কোন শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হলে, আরবী ভাষাবিদদের নিকট সেটি অপরিচিত হলে ও অপছন্দনীয় হলে এবং শব্দটির একাধিক অর্থ হলে আর উক্ত অর্থসমূহের মধ্যে বাক্যে কোনটির প্রতি কোন ইঙ্গিত বা قرينة এর উল্লেখ না থাকলে উক্ত শব্দটি غريب বলে বিবেচিত হবে।"[৬৪]

দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন," الغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى অর্থাৎ الغرابةহচ্ছে শব্দটি অস্পষ্ট অর্থবোধক হওয়া।"[৬৫]

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন, " الغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال অর্থাৎ الغرابة হলো কোনো একটি শব্দ এমন বিরল হওয়া, যার অর্থ সুস্পষ্ট নয় এবং এর ব্যবহার অপরিচিত।"[৬৬]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন, غرابةঅর্থ শব্দটি অপরিচিত হওয়া এবং তার ব্যবহার বিরল হওয়া।

الغرابة দুই ভাগে বিভক্ত।[৬৭] যথা:

১. অভিধানে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দীর্ঘ পরিশ্রম করার পর শব্দটির কাঙ্খিত অর্থ অনুধাবন করা যায়।

২. অধিক অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দীর্ঘ পরিশ্রম করার পরও শব্দটির উদ্দিষ্ট অর্থ জানা যায় না।

---

৬৩. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৬৪. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৬৫. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৬৬. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৬৭. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

الكراهة في السمع(শ্রুতিকটু হওয়া)

কোনো শব্দ শ্রুতিকটু হলে তাকে الكراحةفي السمعবলে অভিহিত করা হয়।[৬৮]

যেমন, সাইফুদ্দৌলার প্রশংসায় কবি মুতানাব্বী বলেন :

مبارك الإسم اغر اللقب + كريم الجرشى شريف النسب

এখানে কবি তার ممدوح এর প্রশসংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। তিনি তার প্রশংসায় বলেছেন তার নাম কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ, উপনাম অতি উজ্জ্বল। তিনি উদার ও মহানুভব মনের অধিকারী, তার বংশ অভিজাতপূর্ণ। কবি তার ممدوح এর চমৎকার প্রশংসা করলেও একটি শব্দ তিনি এমন চয়ন করেছেন যা শ্রুতিকটু। শব্দটি হচ্ছে الجرشى ।

الإبهام (অর্থের অস্পষ্টতা)

الإبهام শব্দের অর্থ অস্পষ্টতা, অবোধগম্যতা, দ্ব্যর্থকতা ইত্যাদি।الإبهامএর পারিভাষিক অর্থ প্রদানে ড. মু. নকিবুল্লাহ বলেন, "কোন শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হলে এবং তা বোধগম্য না হলে অথবা যদি শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক হয় আর এমতাবস্থায় কোনটি বক্তার কাঙ্খিত অর্থ তা জানা না যায় তবে তাকে الإبهام বলে।"[৬৯]

আল্লামা নাসিফ আল-ইয়াজিযী বলেন," الإبهام هو ان يكون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا قرينة تدل على أيهما المقصود অর্থাৎ الإبهام হচ্ছে ঐ শব্দ যা দ্ব্যর্থ বোধক হয় এবং এর মধ্যে কোনো قرينة পাওয়া যায় না যার দ্বারা উভয়টির উদ্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করে।"[৭০]

যেমন- কোনো ব্যক্তির বক্তব্য لقيت فلانا فعزرته"আমি অমুকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম অতঃপর তাকে সম্মান /অপমান করলাম।"

---

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৭০.এামাউল আদাব, পৃ. ৪

উপর্যুক্ত বাক্যের عزر শব্দটি দ্বারা দু'টি অর্থ প্রদান করে-সম্মান ও অপমান । সুতরাং দু'টির সম্ভাবনাই রয়েছে। কিন্তু বক্তা কোনো قرينة বা ইঙ্গিত প্রদান করে নাই-যার কারণে এটিالإبهامহয়েছে।[৭১]

فصاحة الكلام (বাক্যের বিশুদ্ধতা)

দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, فصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات ومن ضعف التاليف ومن التعقيد مع فصاحة كلماته অর্থাৎ فصاحة الكلامহচ্ছে, বাক্যে কয়েকটি শব্দএকত্রে মিলিত হওয়ার কারণে যে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হবে, বাক্যের দুর্বলতা ও বাক্য গঠনের লুপ্ত অর্থবিশিষ্ট হতে মুক্ত হবে এবং সকল শব্দ তার সাথে فصيح হবে।"[৭২]

আল্লামা তাফতাযানী বলেন, الفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التاليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحته অর্থাৎ فصاحة الكلام হচ্ছে, বাক্যটি ضعف التاليف থেকে মুক্ত হওয়া। এমতাবস্থায় যে, উক্ত বাক্যের সবগুলো শব্দ تعقيد ও تنافر الكلمات ফাসাহাতপূর্ণ হবে।"[৭৩]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন,"কোন কালাম فصيح হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো কালামের প্রতিটি কালিমা فصيح হওয়া, দ্বিতীয় শর্ত হলো কালামটি تنافر الحروف থেকে মুক্ত হওয়া। তৃতীয় শর্ত হলো ضعف التاليف থেকে মুক্ত হওয়া।"[৭৪]

---

৭১. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৭২. হাফনী বেগ নাসিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৭৩. মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৭৪. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন,“ فصاحة الكلام হতে হলে বাক্যটিকে অবশ্যই فصاحة الكلمة এর শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে كثرة التكرار، التعقيد، ضعف التاليف، تنافر الكلمات تتابع الإضعافহতে মুক্ত হতে হবে।”

تنافر الكلمات (বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের উচ্চারণে পরস্পর বিরোধপূর্ণ হওয়া)

تنافر الكلمات বাক্যের এমন একটি অবস্থা যেখানেব্যবহৃত শব্দসমূহের অসঙ্গতির কারণে সেগুলো শুনতে শ্রুতিকটু লাগে এবং একত্রে উচ্চারণে কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে। যদিও প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে বিশুদ্ধ ও উচ্চারণে সহজসাধ্য হোক না কেন।[৭৫]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন,“ تنافر الكلمات অর্থ বাক্যস্থ প্রতিটি কালিমার আলাদা উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর একত্র উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু হওয়া।”[৭৬]

ضعف التاليف (গঠন প্রকৃতিতে দুর্বলতা)

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন, “বাক্যের গঠনপ্রকৃতি দুর্বল হওয়াকে ضعف التاليف বলে। বস্তুত বাক্য গঠনে আরবী ব্যাকরণেরপ্রসিদ্ধ নিয়ম (القانون النحو المشهور) অনুসরণ না করাকে ضعف التاليف বলে।”[৭৭]

এ প্রসঙ্গে আবু তাহের মেসবাহ বলেন,“ ضعف التاليف অর্থ نحو বা ব্যাকরণের সুপ্রচলিত নিয়ম থেকে বাক্যের বিচ্যুতি ঘটা।”[৭৮]

---

৭৫. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৭৬. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৭৭. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৭৮. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

التعقيد(দুর্বোধ্যতা, জটিলতা, অস্পষ্টতা)

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন,“ ইস্পিত অর্থের প্রতি বাক্যের অস্পষ্ট ব্যবহারকে التعقيد বলে।”[৭৯]

ড. মু.নকিবুল্লাহ التعقيد কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৮০]যথা:

ক) التعقيد اللفظى (শাব্দিক দুর্বোধ্যতা)

খ) التعقيد المعنوى (অর্থগত দুর্বোধ্যতা)

التعقيد اللفظى (শাব্দিক দুর্বোধ্যতা)

আবু তাহের মেসবাহের মতে,“ تعقيد لفظى অতি বিন্যাসগত বিশৃঙ্খলার কারণে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়া।”[৮১]

উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি বাক্যের অস্পষ্টতা যদি শব্দের দিক দিয়ে হয়, যেমন শব্দের تقديم অথবা تأخير এর মধ্যেفصل، مستثنى منه مستثنى এর بدل এর উপর مبدل منه এর উপর مستثنى এর تقديم، منهএর উপর مستثنى এর تقديم তবে তাকেالتعقيد اللفظى বলে।”[৮২]

التعقيد المعنوى (অর্থগত দুর্বোধ্যতা)

---

৭৯. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৮০.ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৮১. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৮২.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

অস্পষ্টতা যদি অর্থের দিক দিয়ে হয়, যেমন অপ্রচলিত مجاز (রূপক) ও كناية (ইঙ্গিত) ব্যবহার করার কারণে বক্তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারা না যায় তবে সেটাকে التعقيد المعنوى বলে।[৮৩]

كثرة التكرار (পুনরাবৃত্তি)

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন, "বাক্যে একই শব্দ-সেটি اسم হোক অথবা فعل হোক অথবা حرف، ظاهر اسم হোক কিংবা ضمير اسم হোক,কোন فائدة ছাড়া বার বার ব্যবহার করাকে كثرة التكرار বলে।"[৮৪]

تتابع الإضافات (ধারাবাহিক ভাবে একাধিক সম্বন্ধ পদের ব্যবহার)

'বাক্যে পরপর একাধিক সম্বন্ধ পদ বা إضافة এর ব্যবহারকে تتابع الإضافات বলে।' [৮৫]

تتابع الأوصاف (ধারাবাহিকভাবে একাধিক صفة ব্যবহার করা)

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন, " تتابع الأوصاف বলা হয় বাক্যে পরস্পর একাধিক গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা।"[৮৬]

فصاحة المتكلم

---

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৮৫. প্রাগুক্ত
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন, " فصاحة المتكلم এটি এমন এক প্রকার দক্ষতা/ক্ষমতা যার বদৌলতে বক্তা তার ইচ্ছামত মনের ভাব বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।"[৮৭]

আবু তাহের মেসবাহ বলেন," فصاحة المتكلم অর্থ যে কোন বিষয়ে فصيح كلام দ্বারা উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম প্রকাশ করার যোগ্যতা।এ যোগ্যতা যার মাঝে রয়েছে তাকে فصيحবলা হয়।"[৮৮]

فصاحة المتكلم হচ্ছে এমন এক যোগ্যতা যার সাহায্যে বক্তা তার ইচ্ছানুসারে মনের ভাব বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে।

البلاغة অলঙ্কার

অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ ভাষায় বক্তা তার মনের ভাব শ্রোতার নিকট পৌঁছে দেয়ার নামই البلاغة ।[৮৯] এর পরিচয় সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে এর ব্যবহারিক দিকটি নিয়েআলোচনা করবো। 'ব্যবহারিক ক্ষেত্রে بلاغة শব্দটি كلام (বক্তব্য) এবং متكلم (বক্তা)-এর وصف (বিশেষণ/গুণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।'[৯০] আবু তাহের মেসবাহ বলেন," بلاغة শব্দটি كلام ও متكلم এর صفة বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।"[৯১] ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে البلاغة তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:

ক) بلاغة الكلام

খ) مقتضى الحال

---

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৮৮. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৮৯. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৯০. প্রাগুক্ত

৯১. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

গ) بلاغة المتكلم

এ পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হবে।

بلاغة الكلام (চাহিদা অনুযায়ী বাক্য)

بلاغة الكلام এর পরিচয় দিতে গিয়ে বিশিষ্ট আরবী অলঙ্কারবিদ আবু তাহের মেসবাহ বলেন, "بلاغة الكلام অর্থ স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী ফাসীহ কালাম দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা।"[৯২]

তিনি আরো বলেন, "যে স্থানে ও যে সময়ে আমি কথা বলছি এবং যাদের সম্পর্কে বা যাদের সম্বোধন করে কথাবলছি। আমার কথা যেন সেই স্থান, সেই সময় এবং সেই লোকদের উপযুক্ত হয়।"[৯৩]

ড. মু.নকিবুল্লাহ বলেন," স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে بلاغة الكلام বলে।"[৯৪]

মোট কথা, অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ ভাষায় ইচ্ছামতো মনের ভাব প্রকাশ করাকে بلاغة الكلام বলা হয়।

مقتضى الحال (অবস্থার চাহিদা)

স্থান-কাল-পাত্রকে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় الحال বলে এবং স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদাকে مقتضى الحال বলে।الحال বাস্থান-কাল-পাত্র এমন একটি অবস্থা যা বক্তাকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ কথা বলার সেই বিশেষ পদ্ধতিকে مقتضى الحال বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা বলে।[৯৫]

এ সম্পর্কে আবু তাহের মেসবাহ বলেন," স্থান-কাল-পাত্রকে আরবীতে حال বলে এবং স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদাকে مقتضى الحال বলে। কথা যত সুন্দর হোক যদি তা

---

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৯৩. প্রাগুক্ত
৯৪. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৯৫. প্রাগুক্ত

مقتضى الحال(স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা)অনুযায়ী না হয় তাহলে البلاغة এর স্তর থেকে নেমে যায় এবং সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।"[৯৬]

بلاغة المتكلم

আবু তাহের মিসবাহ বলেন,"بلاغة المتكلم অর্থ যে কোন বিষয়ে দ্বারা মনের ভাব ওমর্ম প্রকাশের স্বভাব যোগ্যতা। এ যোগ্যতা যার মাঝে রয়েছে তিনি হলেন بليغ كلام ।"[৯৭]

তিনি আরো বলেন,"একজন بليغ কে অবশ্যই স্বভাব যোগ্যতা, সু রুচি ও সৌন্দর্যবোধের অধিকারী হতে হবে।

যাতে তিনি স্থান-কাল-পাত্র ও তার চাহিদা অনুধাবন করতে পারেন। সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য বঝতে পারেন এবং এমন শব্দ ও মর্ম এবং ভাবও ভাষা চয়ন করতে পারেন যা শ্রোতার মনে পূর্ণ রেখাপাত করে এবং তার অন্তরে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফলে বক্তা ও শ্রোতার মাঝে ভাব ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ কালাম ফসীহ হওয়া এবং বক্তব্য مقتضى الحال বা স্থান-কল-পাত্রের চাহিদা মুতাবিক হওয়া বালাগাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্র। এক কথায় বালাগাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ভাষার যাদু বিস্তার করে শ্রোতার মন জয় করাএবং নিজের ভাব ও মর্ম শ্রোতার অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে দেয়া। এ বিষয়ে যিনি যত বেশী পারদর্শী তিনি তত বড় بليغ । এ ক্ষেত্রে একজন বালীগ ও একজন অংকন শিল্পীর মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। শুধু এই যে, بليغ শব্দমালার সাহায্যে শ্রোতার অন্তর জগতে প্রবেশ করেন। আর অংকন শিল্পী রং তুলীর সাহায্যে দর্শক চিত্ত জয় করেন। এ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তারা অভিন্ন।কেননা শিল্পি যখন ছবি আঁকার চিন্তা করেন তখন প্রথমে তিনি কল্পিত ছবির উপযোগী রং ও বর্ণ চয়ন করেন। অত:পর তুলির সাহায্যে সবকটি রং ছবির গায়ে এমন সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত করেন যা দর্শকের দৃষ্টি মুগ্ধ করেএবং অনুভূতিকে দোলা দেয়।

৯৬.আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২
৯৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

তদ্রুপ بليغ যখন কোন কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করতে কিংবা কোন বক্তব্য পেশ করতে চান তখন প্রথমেই তিনি বিষয়টির বিভিন্ন দিক চিন্তা করেন অতঃপর এমনিভাবে শব্দ চয়ন করেন যা অধিকতর শ্রুতিমধুর এবং এমন প্রকাশ শৈলী গ্রহণ করেন যা অধিকতর সাবলীল ও আবেদন পূর্ণ এবং এমন সকল প্রসংগ উত্থাপন করেন যা বিষয় বস্তুর সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ।

এ ভাবে একদিকে শিল্পির দর্শকমন্ডলী ছবি ও তার রং প্রয়োগর সৌন্দর্য ও কুশলতায় বিমুগ্ধ হন। অন্যদিকে بليغ এর শ্রোতাবর্গ ভাব ও মর্ম এবং ভাষা ও শব্দের যাদুতে বিমোহিত হন।"[৯৮]

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ জাহিলী যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহিলী যুগঃ পরিচিতি ও পরিধি

আরবী الجهل শব্দ থেকে জাহিলী শব্দটি এসেছে। الجهل এর অর্থ হচ্ছে, অজ্ঞতা, মূর্খতা। এর বিপরীতে দু'টি আরবী শব্দ রয়েছে। এর একটি হচ্ছে, العلم অন্যটি হচ্ছে, الحلم । العلمশব্দের অর্থ হচ্ছে, জ্ঞান, বিদ্যা, জানা, পরিচিতি লাভ করা। অন্যদিকে الحلم শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ভদ্রতা প্রভৃতি। গবেষকগণ মনে করেন জাহিলী শব্দটি الحلم শব্দের বিপরীতে এসেছে; العلمশব্দের বিপরীতে নয়। الجهل শব্দটি পূর্বে উল্লেখিত অর্থসমূহে অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য, বোকামী, বাড়াবাড়ি, হঠকারিতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৯৯]

শব্দটি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্যে ব্যাবহৃত হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে এভাবে:

মুসা বলল, আমি আল্লাহ কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যাতে আমি জাহিলদের অন্তর্ভূক্ত না হই। (সুরাহ বাকারা: ৬৭)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

প্রাচীন জাহিলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শণ করে বেড়িয়ো না। (সুরাহ নূর : ৩৩)

জাহিলী যুগের পরিধি বা সময়কাল নিয়ে গবেষকদেন মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিশিষ্ঠ আরবী সাহিত্য বিশারদ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন বলেন, " প্রগৌতিহাসিক কাল হতে শুরু করে রাসূলুল্লাহ (স,) এর আবির্ভাব পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ সময়কে জাহিলী যুগ বলা হয়েছে।"[১০০]

---

৯৯. ড. মুহাম্মদ আদুল মাবুদ, *আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৯৮

১০০. প্রাগুক্ত

আবার কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রায় ১০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত সময় অর্থাৎ ৫২৫-৬২২খ্রি. আরবী সাহিত্যের জাহিলী যুগ।[১০১] আমরা মনে করি জাহিলী যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে।

এই জাহিলী যুগই আরবী কবিতার স্বর্ণযুগ। এ যুগে আরবী সাহিত্যাকাশে এক ঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা আরবী কাব্য জগতে এক বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন। এ সকল প্রতিভাবান কবির অনন্য সাধারণ রচনাশৈলী আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে সুউচ্চ স্থানে সমাসীন করেছে।

---

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহিলী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র

বক্তব্যকে সরল ও সুন্দর, রমনীয় ও রসোত্তীর্ন করে প্রকাশ করাই অলঙ্কার।[১০২] মনের ভাব শুদ্ধ,সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আকর্ষণীয় করে শ্রোতার নিকট পৌঁছে দেয়াই বালাগাত বা অলঙ্কার।[১০৩] আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আসতে বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরোতে হয়েছে। সেই জাহিলী যুগেই এর উৎপত্তি অর্থাৎ তখন থেকে আরবি অলঙ্কারের যাত্রার প্রারম্ভ। এ সম্বন্ধে ড. মু. নকিবুল্লাহর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আরবী অলঙ্কার বা বালাগাত এর উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের দৃষ্টি সহজেই প্রাচীন আরবী কাব্য-সাহিত্যের প্রতি নিবদ্ধ হয়। সেকালে সৃষ্ট সাহিত্যে অলঙ্কারের সুষ্ঠু ব্যবহার আমাদিগকে অভিভূত করে। তাই সহজেই বলা যায়, প্রাচীন কালের আরবী কাব্য সাহিত্য অলঙ্কার তথা বালাগাতের উৎপত্তিস্থল।"[১০৪]

سجع বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য আরবী সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলেও মানসম্পন্ন সাহিত্য আরবি কবিতার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। আরবী কবিতার উদ্ভব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু জানা যায় না। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, ছন্দোবদ্ধ গদ্য থেকেই আরবী কবিতার উদ্ভব ঘটেছে।[১০৫] سجع থেকে رجز ছন্দে আরবী কবিতা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাব ও ভাষায় আসে প্রসারতা আর অর্থ ও মনে আসে গভীরতা। আর এসব ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মাঝে। মরুবাসী বেদুইনরাই رجزছন্দে রচিত আল-হিদা কবিতার ধারক ও বাহক। উটের চলার তালে তালে এসব কবিতা গীত হতো চালকের মাধ্যমে। এই رجزছন্দের আরবী কবিতা মরুর উটের পিঠ থেকে তাবুতে, তাবু থেকে

---

১০২. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১০৩. প্রাগুক্ত

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১০৫. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরারিয়্যাহ* (বৈরুত: মানশুরাতু দারু মাকতাবাতুল হায়াহ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ.৫৭

গোত্র-গোত্রান্তরে, হাট-বাজারে ও মেলায় যায়গা করে নেয়। অতঃপর মেলার ভীড় পেরিয়ে শহরে বন্দরে এমনকি রাজা-রাজরাজাদের দরবারের আরবী কবিতা সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।[১০৬]

আরবী ভাষার প্রথম কবি কে তা জানা যায় না। অধিকাংশ আরবী ভাষাবিদের মতে মুহালাইল ইব্ন রবীয়াহই প্রথম মানসম্পন্ন কাবতার রচিয়তা। কবি মুহালহিল ছিলেন তাগলিব গোত্রের প্রধান কুলাইব এর ভাই। কুলাইব ছিলেন বীর পুরুষ। তিনি ইয়েমেনী আরবদের এক যুদ্ধে পরাজিত করে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন বকর গোত্রের মুররার কন্যা হালিলাকে। হালিলার ভাই জাসসামের এক খালা ছিল-তার নাম বাসূস। বাসূসের এক অতিথির উটনী কুলাইবের বাগানে প্রবেশ করে পাখির বাসা নষ্ট করে ফেলে। এতে কুলাইব রাগান্বিত হয়ে উপর্যুক্ত উটনীকে হত্যা করে।বসুসের প্ররোচনায় জাসসাম কুলাইবকে হত্যা করে। এর ফলে বনু তাগলিব ও বনু বকরের মধ্যে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধ। যা চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যাকে বাসূস যুদ্ধ বলা হয়।[১০৭]

কুলায়বের মৃত্যুর পর তার ভাই মুহালাইল ইব্ন রবীয়াহ একটি দীর্ঘ শোক গাথাঁ কাসীদাহ রচনা করেন। যা আরবী অলঙ্কারমন্ডিত মানসম্পন্ন প্রথম কবিতা। মুহালহিল ইব্ন রবীয়াহর প্রকৃত নাম আবু লায়লা আদিয়্যা ইব্ন রবীয়াহ। মুহালহিল ছিল তার উপাধি। মুহালহিল অর্থ মহৎকারী। তিনিই প্রথম কবি যিনি সহজ,সরল ও সাবলীল ভাষায় আরবী কবিতা রচনা করেন। এজন্য তাকে এ-উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি বনু তাগলিবের জুশাম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মুআল্লাকার শ্রেষ্ঠ কবি ইমররুউল

---

১০৬. মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্বকিবদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৮

১০৭. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), ৪র্থ সং, পৃ. ৩৩

কায়েসের মামা ও মুআল্লাকার অপর কবি আমর ইব্ন কুলসুমের নানা ছিলেন। তিনি ৫৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার ভাই কুলাইবের মৃত্যুর পর তিনিই বাসূস যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। মুহালহিলের কাব্য ধারায় পরবর্তী শতাব্দী ব্যাপী আরবী কবিতা রচিত হতে থাকে। তাঁর কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:

كليب لا خير في الدنيا ومن فيها + ان انت خليتها فيمن يخليها
كليب اى فتى عز ومكرومة + تحت السقائف اذ يعلوك سافها
نعى النعاة كليبا إلي فقالت لهم + مادت بنا الأرض أم مادت رواسيها
ليت السماء على من تحتها وقعت + وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها

"হে কুলাইব! দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে,তার কোনটিতেই কোনো মঙ্গল নেই যদি তুমি দুনিয়া ছেড়ে যাও।

আর যে দুনিয়া ছেড়ে গেল সে সংবাদেও নেই কোনো গুরুত্ব ও আকর্ষণ। কুলাইব ! হে যুবক, নীলাকাশের নীচে ত তুমি সম্মান ও আভিজাত্যের অধিকারী। (শত্রুরা) তোমাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে করেছে পরাভূত।

শোকার্ত রমনীরা কুলাইবের জন্য বিলাপ করেছে আমার কাছে। তখন আমি বলেছি তাদেরকে, আমাদেরকে নিয়ে কাঁপছে পৃথিবী, নাকি দুলছে তার পর্বত রাজি।

কতই না ভালো হত!যদি ভেঙে পড়তো আকাশ পৃথিবীর উপর, আর ভেঙে চৌচির হয়ে যেতো পৃথিবী। ফলে চুরমার হয়ে যেতো যা কিছু আছে ভূমন্ডলে সবই।"[১০৮]

জাহিলী যুগে যেসব কবির কবিতা আরবী অলঙ্কারমন্ডিত তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কবিতার নমুনা নিম্নে প্রদান করা হল।

---

১০৮. ড. আব্দুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২১

জলীলা বিনতে মুররা (মৃ.৫৩৮ খ্রি.)

জলীলা বিনতে মুররা বসু বকর বকর গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। বৈবাহিক জীবনে তিনি কুলাইব ইব্ন রবীয়াহ -এর স্ত্রী ছিলেন। তার ভাই জাসসাম আশ-শারবালী কুলাইবকে হত্যা করে। যার ফলে বাসুস যুদ্ধ শুরু হয়। স্বামীর মৃত্যুও পর জলীলা স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে পিতার গৃহে গমন করেন। এতে করে কুলাইবের ভগ্নি তাকে তিরস্কার করে।কবি তার মাধ্যমে তিনি তার ননদিনীর তিরস্কারের জবাব দেন। তিনি বলেন :

يا ابنة الأقوام ان لمت فلا + تعجلى باللوم حتى تسالى

"হে গোত্র ননদিনী, আমাকে তিরস্কার করছ! অত ত্বরা কেন ?তিরস্কার করার পূর্বে একটু জিজ্ঞেসতো করবে।"[১০৯]

শন ফারা আযদী (মৃ ৫১০ খ্রি.)

শন ফারা আযদী ইয়েমেনের আযদ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে বীর-বাহাদুর ও কবি ছিলেন। অতর্কিত আক্রমণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতি দ্রুত দৌড়াতে পারতেন তিনি। দ্রুতগামী অশ্বও দৌড়ে তাঁর নিকট হেরে যেতো। তার অমর কীর্তি লামিয়াতুল আরব তাকে খ্যাতিমানকরেছে। এ কবিতায় তিনি আরব চরিত্রের নিখুত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এতে তিনি আরব চরিত্রের অন্যতম দিকবীরত্ব,সাহস ও অসাধারণ কার্যক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন। তার কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:

---

১০৯. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত,*পৃ. ১১৫

لا تقربى ان قبرى محرم + عليكم ولكن ابشرى أم عامر
اذا احتملوا رأسى وقى الراس اكثر + وغود وعند الملتقى ثم سائرى
هناك لا ارجو حياة ترنى + سجيس الليالى مبسلا بالجراثر

"আমাকে তোমরা কবর দিও না, তোমাদের কোনো অধিকার নেই আমাকে কবর দেওয়ার ; বরং হে হায়েনার দল,তোমরা আমার মৃত্যুতে আনন্দ করবে।
শত্রুরা আমার দেহের সেরা অংশ মস্তকটি আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে। আর বাকীটুকু তোমাদে জন্য ফেলে দিয়ে যাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে।
কারণ আমি আমার গোত্রের আমার বিপদেও বোঝা তুলে দিয়ে সুখে জীবন যাপন করতে চাইনা।" [১১০]

তাআব্বা শাররান (মৃ.৫৩০)

তাআব্বা শাররান শানফারা আযদীর সহচর ছিলেন। তিনি দুঃসাহসী বীর পুরুষ ছিলেন। তার প্রকৃত নাম সাবিত ইব্ন জাবির ইব্ন সুফিয়ান।তিনি ইয়েমেনের ফাহম গোত্রের জন্ম গ্রহণ করেন। একদা তিনি তরবারি বগলদাবা করে বাইরে যান। এমতাবস্থায় তার সাথীরা তার মায়ের নিকট তিনি কোথায় গিয়েছে জানতে চায়। তার মা তাদেরপ্রশ্নের জবাবে বলেন, "تأبط شرا وخرج সে দুষ্টামি বগলে চেপে বেরিয়ে পড়েছে।এরপর থেকে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে যান।[১১১] তিনি তার সহচরের মতোই দৌড়াতে পারতেন। তিনি চৌর্য বৃত্তি করে জীবিকা নিবাহ করতেন।

---

১১০ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮
১১১. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮

বনু লহয়ানের এলাকায় পাহাড় চুড়ায় মধু চুরি করতে গেলে লোকেরা তাকে ঘিরে ফেলে, কিন্তু তিনি অপূর্ব কৌশলে ও বীরত্বের সাহায্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি তার নিজ সম্পর্কে বলেন :

قليل التشكى للمهم يصيبه + كثير الهوى شتى النوى والمسالك
يظل بموماة ويمسي بغيرها + جحيشا ويعرورى ظهور المهالك

“সে অসীম ধৈর্য বিপদ-আপদেও মোকাবেলা করে ; কারো কাছেই সে বিপদের অভিযোগ করেনা।
তার আকাঙ্খার সীমা নেই, কামনার শেষ নেই,তার জীবন পথ নিত্য নতুন বাকের সৃষ্টি করে। তার রাত কাটে এক মরুভূমিতে দিন কাটে অন্য মরুভূমিতে,সে একাই নির্ভীক চিত্তে মহাবিপদ-সঙ্কুল স্থানে প্রবেশ করে।”[১১২]

আবীদ ইব্ন আল-আবরস (মৃ. ৫৫৪ খ্রি.)

কবি আবীদ ইব্ন আল-আবরাস বনু আসাদ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইমরুউল কায়েসের সমসাময়িক ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক সময় কবিতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কবি প্রাথমিক জীবনে খুব দরিদ্র ছিলেন।কিছু সংখ্যক মেষ ও বকরী ছিল তার একমাত্র সম্পদ। একবার তিনি তার মেষ ও বকরী নিয়ে পানি পান করাতেযাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বনু মালেকের জনৈক ব্যক্তি তাকে বাঁধা দেয় এবং তার বোনকে অপবাদ দিয়ে কবিতা বলে। কবি এর কোনো যথার্থ জবাব দিতে পারেননি। মনের দুঃখে একটি গাছের নিচে বসে থাকেন এবংএক পর্যায়ে ঘুমিয়ে যান।ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি কবিতার গুলি খাইয়ে দিয়েছেন। ঘুম থেকে জেগেই তিনি কবিতা রচনা

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

করেন এবং বনু মালিকের ঐ ব্যক্তির কবিতার যথার্থ জবাব প্রদান করেন।এরপরথেকে তিনি অনায়াসে কবিতা রচনা করতে থাকেন। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন শক্তিমান কবি। তার কবি খ্যাতিচারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তিনি বনু আসাদের বিশিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করেন।[১১৩]

কবি ইমরুউল কায়েসর পিতা হুজর বনু আসাদের বাদশা ছিলেন। বনু আসাদ হুজরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবংকর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এতে রাগান্বিত হয়ে হুজর বনু আসাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন আরকতককে বন্দী করে রাখনে। বন্দীদের মধ্যে কবি আবীদও ছিলেন। তিনি হুজরের নিকট কবিতার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে হুজর সকলকেই মুক্তিদান করেন। অতঃপর সময় সুযোগ মতো বনু আসাদ হুজরকেহত্যা করে।[১১৪]

কবি আবীদ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। কারো মতে তিনি দুশ বছর জীবিত ছিলেন। কারো মতে তিনি তিনশ বছর জীবিত ছিলেন। তার কবিতায় গভীর চিন্তাধারা ও সুন্দর রচনাশৈলী লক্ষ করা যায়।তার কবিতার ভাষা সহজ ও সাবলীল। অতি সহজ ভঙ্গিতে তিনি তার কাব্যে বেদুইন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উপদেশ মূলক সুন্দর বাক্যের সমাবেশ তার কাব্যকে আরো বিকশিত করেছে। তার কবিতার নমুনা নিম্নররূপ :

يا ايها السائل عن مجدنا + انك عن ساعتنا غافل
ان كنت لم تسمع بأبائنا + فسل تنباء ايها السائل
سائل تنا حجرا غداة الوغى + يوم تولى جمعه الحافل

---

১১৩ . প্রাগুক্ত.পৃ. ১০০
১১৪ . প্রাগুক্ত

"আমাদের প্রতাপ প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানতে চাও; তুমি আমাদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহলে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের উত্তম কাজ সম্বর্কে না জানলে জিজ্ঞেস করতে পার যাকে খুশি তাকে।

যুদ্ধের প্রভাতে হুজরের সঙ্গে আমাদের যা ঘটেছিল তাদের কাছে জেনে নাও। তারা তাদের দলবলসহ সেদিন পালিয়েছিল।"[১১৫]

সামওয়াল ইব্ন আদিয়্যাহ (মৃ.৫৬০ খ্রি.)

কবি সামওয়াল মদীনার উত্তরে অবস্থিত তায়মা নামক পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করতেন।তিনি ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অঙ্গীকার ও আমানত রক্ষায় তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি অতিথিপরায়ণ হিসেবেও মাশহুর ছিলেন। তিনি নিজ নির্মিত দূর্গে বসবাস করতেন। দূর্গের পার্শ্বে একটি কূপ খনন করে পথিকদের জন্য পানির ব্যবস্থাকরেন তিনি। পানির সাথে খাদ্যও সরবরাহ করতেন।[১১৬]

কবি ইমরুউল কায়েসের সাথে তার হৃদ্যতা ছিল। ইমরুউল কায়েস শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলেন।পথিমধ্যে কবি সামওয়ালের আতিথ্য গ্রহণ করেন।তথায় কয়েকদিন অবস্থানের পর কবি সামওয়ালের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পাঁচটি লৌহ বর্ম রেখে সিরিয়া চলে যান। ইমরুউল কায়েসের সাথে হীরা অধিপতির পুরনো শত্রুতাছিল। তিনি বিষয়টি জানতে পেরে সামওয়ালের নিকট উপর্যুক্ত পাঁচটি লৌহবর্ম দাবি করলে সামওয়াল তা দিতেঅস্বীকার করেন। এগুলো আমানত- আর আমানত সে ব্যক্তির নিকটই ফিরিয়ে দিতে হবে যে গচ্ছিত রেখে গেছে।

---

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

সামওয়ালের আচরণে হীরা অধিপতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং হারিস ইব্ন যালিমের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন। উপর্যুক্ত বাহিনী কবির দূর্গ অবরোধ করে এবং এক পর্যায়ে তাঁর ছেলেকে পাকড়াও করে বর্মগুলোদাবি করে। কিন্তু কবি তাতে সম্মত হননি।অতঃপর তারা তার ছেলেটিকে নির্মমভাবে তাঁর চোখের সামনে হত্যাকরে তথাপি তিনি বর্ম ফেরত দেননি। আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এ কুরবানী যুগ যুগ ধরে আরবরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে যাচ্ছে।

ওয়াদা রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি আরব ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তার নামে একটি প্রবাদ বাক্য আছে- اوفي من السموالى

"সামওয়ালের থেকে অধিক ওয়াদা পালনকারী"[১১৭]

তিনি কবিতা রচনায়েও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাব্যে সদোপদেশ লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতার নমুনা:

اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه + فكل رداء يرتديه جميل

وما مات منا سيد انفه + ولاطل منا حيث كان قتيل

فنحن كماء الم زن ما في نصابنا + كهام ولا فينا يعد بخيل

"মানুষের চরিত্র স্বভাব দ্বারা কলুষিত না হলে সে যে পোশাকই পরুক না কেন সুন্দর দেখাবে।

---

১১৭ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

আমাদের কোনো সরদার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেনি, এবং কোনো নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়েদেওয়া হয়নি।

আমরা বৃষ্টির পানির ন্যায় (স্বচ্ছ ও উদার), আমরা সদ বংশজাত এবং আমাদের কেউ কৃপণ নয়।"[১১৮]

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭

হাতিম তাঈ (মৃ. ৬০৫ খ্রি.)

হাতিম তাঈ-এর প্রকৃত নাম হাতিম ইব্ন আব্দুল্লাহ। তিনি ইয়ামেনের বিখ্যাত তাঈ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তিনি তাঈ গোত্রের সরদার ছিলেন। হাতিম তাঈ কবি খ্যাতির চেয়ে দানবীর হিসেবেই বেশি খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর মাতা ছিলেন দানশীল মহিয়সী নারী। তাঁর নিকট থেকে তিনি এ উত্তরাধিকার লাভ করেছেন বলেই অনুমিত হয়। দানশীলতা ও অতিথি পরায়ণতার জন্য বিশ্ব ইতিহাসে তিনি কিংবদন্তী হয়ে আছেন। তাঁর সম্পর্কে বহু উপকথা চালু আছে।[১১৯]

শৈশব থেকেই হাতিম তাঈর মধ্যে সদগুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। দানশীলতা ছিল তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। অতিথি ছাড়া তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন না। তাঁর পিতা তাকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে যান। তাঁর দানশীলতা তাঁকে বেচইন করে তুলে। এর ফলশ্রুতিতে তাঁকে দূর মরুভূমিতে উট চড়ানোর কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাতিম তাঈ ধূ ধূ মরুর পথে পথে অতিথি খূঁজতে থাকেন। অতঃপর ভাগ্যক্রমে তিনি তিনজন অতিথির দেখা পান। তাঁদের মধ্যে কবি নাবিঘা আয-যুবইয়ানী ও কবি আবীদ ইব্ন আবরাসও ছিলেন। হাতিম এ তিনজন অতিথির জন্য তিনটি উট জবাই করে আপ্যায়ন করেন। অতঃপর বিদায় বেলায় তাদের তিনজনকে একশত করে তিনশত উট উপহার প্রদান করেন। অতিথিগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে এ অসাধারণ বদান্যতার কথা বর্ণনা করেন। এভাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর পিতা তা জানতে পেরে তাকে তিরস্কার করেন। হাতিম তাঁর পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "এ দানের মাধ্যমে আমি আপনার জন্য চিরস্থায়ী সুখ্যাতি অর্জন করেছি।" রজব মাসের চাঁদ উদিত হলে প্রতিদিন তিনি দশটি উট জবাই করে তিনি অতিথি সৎকার করতেন। পুরো মাস জুড়ে চলতো অতিথি

---

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

আপ্যায়ন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ স্বভাবের উপর সুদৃঢ় ছিলেন।[১২০] কবি হাতিম সম্পদের পূজারী ছিলেন না। সম্পদকে তিনি তাঁর দাসে পরিণত করেছিলেন। কবি বলেন:

إذا كان بعض المال ربا لأهله + فإنى بحمد الله مالى معبد

"কোনো ধনী ধনের পূজারী, ধন তার প্রভূ। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, সম্পদ তো আমার অনুগত দাস।"[১২১]

কবি হাতিম তাঈ বীর যুদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি একজন বাহাদুর সিপাহীর যথার্থ ভূমিকা পালন করতেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর কাব্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর কাব্যে দানশীলতা, অতিথিপরায়ণতা, মানবিকতা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। তাঁর দিওয়ান লন্ডন ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দুই সন্তান আদী ইব্ন হাতিম তাঈ ও সাফীনা বিনতু হাতিম তাঈ ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২২] তাঁর কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:

أماوى أن المال غاد ورائح + ويبقى من المال الأحاديث والذكر
أماوى أن يصبح صداوى بقفـــــرة + من الأرض لا ماء لدي ولا خمر
ترى أن ما أنفقت لم يك ضرنى + وان يدى مما بخلت به صفر
أماوى أن المال اما بذلة + فاوله شكر واخره ذكر
وقد علم الأقوام لو أن حاتما + أراد ثراء المال كان له وفر

"হে মাবি, ধন ঐশ্বর্য অস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই, কিন্তু দান করে যে খ্যাতি লাভ হয় তা চিরস্থায়ী।হে মাবি, আমি একদিন এমন এক উজার ভূমিতে গিয়ে পৌঁছবে যেখানে

---

১২০. প্রাগুক্ত
১২১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

আমার পানিও থাকবে না মদও থাকবে না।তখন তুমি দেখতে পাবে আমি যা দান করেছি, তাতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি আর আমি কৃপণতার মাধ্যমে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলাম, তাও আমার হাতে নেই। হে মাবি, যে সম্পদ আমি দান করলাম, তার জন্য প্রথমে আমি পাবো শোকর আর আখেরে আমার মৃত্যুর পর আমার সুনাম থাকবে স্থায়ী হয়ে।"[১২৩]

হাতিম তাঈ শুধু দানবীরই ছিলেন না তিনি একাধারে বিদগ্ধ কবি, বীর পুরুষ, অতিথিবৎসল ছিলেন। তাঁর কাব্য খ্যাতি দানশীলতার কাছে ম্লান হয়ে পড়ে। তাঁর কাব্য নিঃসন্দেহে অলঙ্কার সম্পন্ন।

আন-নাবিাহ আয-যুবইয়ানী (মৃ. ৬০৪ খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম যিয়াদ ইব্ন মু'আবিয়া।[১২৪] তাঁর উপনাম আবু উমামা মতান্তরে আবু সুমামা।[১২৫] তিনি আন-নাবিঘাহ আয-যুবইয়ানী নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি যুবইয়ান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গেত্রের দিকে নিসবত করে তাঁকে আয-যুইয়ানী বলে অভিহিত করা হয়। নাবিগা শব্দের অর্থ পরিপক্ব। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তিনি কাব্য চর্চায় তিনি মনোনিবেশ করেন। তিনি পরিণত বয়সে অর্থাৎ চল্লিশ উর্ধ্ব বয়সে এসে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। এজন্য তাঁকে আন-নাবিগা হতো।[১২৬] কারো কারো মতে তাঁর কবিতা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছিল বলে এ নামে তাঁকে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন জাহিলী যুগের প্রথম শ্রেণির প্রতিভাবান একজন কবি।[১২৭]

---

১২৩. প্রাগুক্ত
১২৪. হান্না আল-ফাখুরী, পৃ. ১২৮
১২৫. ড. আব্দুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১২৭. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯২

ইমরুউল কায়েস (৪৭০-৫৪০ খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম ইমরুউল কায়েস হুনদুজ ইব্ন হুজর ইব্ন হারিস ইব্ন আমর ইব্ন হুজর আকিলুল মুরার ইব্ন মুআভিয়া ইব্ন ছাওর।[১২৮] তার অন্যান্য নামগুলো হচ্ছে, মুলাকা ও আদী। উপনাম গুলো হচ্ছে, আবু ওয়াহাব, আবু যায়েদ ও আবুল হারিস। তাছাড়া তাঁর কিছু ছদ্মনাম ছিল, সেগুলো হচ্ছে-যুলকুরুহ, মালিকুদ্দালিল। তবে তিনি ইমরুউল কায়েস নামেই পরিচিত। তার উপাধি হচ্ছে, আমীরুশ শুআরা, মালিকুশ শুআরা ও হামিলু লিয়াউশ শুআরা।[১২৯]

কবির মায়ের নাম-ফাতিমা। তিনি ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ বংশ বনু তাগলিব গোত্রের রাবীয়াহ্র কন্যা। সে হিসেবে তিনি আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর কুলায়ব ও কবি মুহালহিলের ভগ্নী।[১৩০]

নাজদের অন্তর্গত বনু আসাদ গোত্রের কিন্দা রাজ পরিবারের কবির জন্ম। এ পরিবারটি ইয়েমেন থেকে এসে নজদ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে এবং স্বাধীন আরবীয় রাজ্য গঠন করে। নজদের আসাদ গোত্রসহ অন্যান্য গোত্রসমূহ এ রাজ পরিবারের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। হীরার অধিপতি তৃতীয় মুনযির কর্তৃক এ রাজ পরিবারের সর্বশেষ নৃপতি ইমরুউল কায়েসের পিতামহ হারিস আক্রান্ত হন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্রগণ এ রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শাসন করতে

---

১২৮. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৯ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ২১৬

১২৯. মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

১৩০. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭; মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

থাকেন। কবির পিতা হুজর বনু আসাদ গোত্রের শাসক ছিলেন। এখানেই কবির শৈশব কৈশোর কাটে।[১৩১]

রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কবি ইমরুউল কায়েস অতি আদর যত্নে লালিল পালিত হন। তিনি মদ, নারী ও জুয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সুন্দরী নারী দেখলেই তিনি কাব্যের মাধ্যমে তাকে প্রেম নিবেদন করতেন। তার প্রেয়সীদের তালিকায় যারা ছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে উনায়যা, ফাতিমা বিনতু উবায়দ ও উম্মুল হারিছ আল-কালবী।[১৩২]

কবির উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন তার পিতা কখনো মেনে নেয়নি। একপর্যায়ে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। কবি পালিয়ে পিতার রুদ্ররোষ থেকে পালিয়ে বাঁচেন। রাগ কমলে পিতা তাকে আবার প্রাসাদে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু প্রাসাদ জীবন তার ভালো লাগেনি ফলে তিনি আবার অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন এবং ইয়েমেনের দাম্মুন অঞ্চলে অবস্থানকালে তার পিতার নিহত হওয়ার সংবাদ জানতে পারেন। তার পিতা আসাদ গোত্রের উপর করারোপ করলে তারা দিতে গড়িমসি করতে থাকে ফলে তিনি তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন। আসাদ গোত্র বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে।[১৩৩]

পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে তিনি এই শপথ করেন যে, যতদিন পর্যন্ত তিনি পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না ততোদিন গোশত ও মদ্যপান করবেন না সেই সাথে মাথার তেলও ব্যবহার করবেন না।[১৩৪]

কবি তাঁর মাতুল গোত্র বনু তাগলিব ও বনু বকর গোত্রের সহায়তায় পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি রোমান সম্রাটের দরবারে উপস্থিত

---

১৩১. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

১৩৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯; মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৭

১৩৪. মৌলানা নূরুদ্দীন আহ্মদ, অস-সব-উল-মুঅল্লকাত (ঢাকা: কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, তা.বি.), পৃ. ৬৪

হন। কিন্তু সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত চলতে থাকে। তিম্মাহ আসাদী সম্রাটের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ফলে সম্রাট কবি সম্রাট সন্ধিহান হয়ে একদল সৈন্য সহ পাঠিয়েও আবার ফেরত নেন। কবি পথিমধ্যে অদ্ভূত এক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[১৩৫]

তিনি তাঁর কাসীদায় সহজ সরল ভঙ্গীতে হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করেছেন- এক্ষেত্রে কোনো ভনিতার আশ্রয় নেননি। তিনি তার মু'আল্লাকায় সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে এসেছেন এবং এমন কিছু রীতি তিনি প্রবর্তন করেছেন পরবর্তী কবিগণ তাই অনুসরণ করেছেন। তিনি তার মু'আল্লাকার শুরুতে প্রিয়ার বিরহের বেদনায় অশ্রুবিসর্জন করেছেন। আরবী অশ্বের অসাধারণ গুণাগুণ তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয়ার অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছেন এবং তার রূপ সৌন্দর্য চমৎকার মুনশীআনায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয়াকে চপলা চঞ্চলা হরিণী বন্য সুঠাম গাভীর সাথে তুলনা করেছেন। প্রিয়ার সাথে তিনি অভিসারে বের হয়েছেন। অশ্লীল কামাচারে লিপ্ত হয়েছেন– সে বিষয়গুলোই তিনি তুলে ধরেছেন। এসব অশ্লীল হলেও ভাষাগত দিক খুবই বিশুদ্ধ এবং উপভোগ্য।[১৩৬]

কবি ইমরুউল কায়েসের কবি ভাষা নিঃসন্দেহে সহজ-সরল ও সাবলীল। তার ভাবনাগুলো সহজ-সরল হৃদয় থেকে উদ্ভূত। কোনো রাখ ঢাক না রেখেই তিনি তার মনের অব্যক্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর সব রচনা সংরক্ষিত হয়নি-অনেক রচনাই কালের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে গেছে। তবে তার মু'আল্লাকা ও দীওয়ান সংরক্ষিত হয়েছে।[১৩৭]

---

১৩৫. মৌলানা নূরুদ্দীন আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১৩৭. প্রাগুক্ত, ৭১

তার কাব্য নিঃসন্দেহে বালাগত সমৃদ্ধ। তবে কোনো কোনো কাব্যাংশের ব্যাপারে বিদগ্ধ গবেষণগণ গঠণমূলক সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সবাই স্বীকার করেছেন- ইমরুউল কায়েসই আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতার নমুনা :

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع + فالهيتها عن ذى تمائم محول

اذا ما بكى من خلفها انصرفت له + بشق وتحتى شقها لم يحول

"গর্ভবতী দুগ্ধবতী তোমার মতো ঢের রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু ভোগ করেছি ঢেরায় পশি।
যখন শিশু উঠতো কেঁদে মুড়িয়ে দিতো অর্ধদেহ
মত্ত বিবশ আধেক তখন আমার নিচে নিঃসন্দেহে।"[১৩৮]

তারাফা ইব্ন আবদ আল-বাকরী (মৃ. ৫৬৪)

প্রকৃত নাম তারাফা ইব্ন আবদ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন সাদ। মায়ের নাম ওয়ারদা বিনতু আব্দিল উযযা। তার মাতা বানু তাগলিব গোত্রের মহিলা ছিলেন।

তিনি বনু বাকর গোত্রে ৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[১৩৯]শৈশবে তিনি পিতাকে হারান।কবির মামা ছিলেন বনু তাগলিব গোত্রের অন্যতম কবি, কবি মুতালাম্মিস। আর তার চাচা ছিলেন বনু বাকর গোত্রের কবি, কবি আল-মুনাক্কাশ আল-আসগর।[১৪০] কবি মাতৃ ও পিতৃ বংশের উত্তরাধিকার হিসেবে কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

---

১৩৮. প্রাগুক্ত, ৭১
১৩৯. প্রাগুক্ত,
১৪০.মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

পিতৃহারা তারাফা তার মাতা ওয়ারদা ও মামা মাবাদের অকৃত্রিম আদর স্নেহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি চাচাদের তত্ত্বাবধানে চলে আসেন এবং তাদের অনাদর অবহেলায় প্রতিপালিত হতে থাকেন।[১৪১] দুরন্ত ডানপিটে স্বভাবের কবির মধ্যে বখাটেপনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যৌবনে পদার্পণ করে কবি মদ্যপানসহ নানাবিদ মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে নৈতিক অবক্ষয়ের শেষ কিনারায় এসে পৌঁছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ তিনি অর্জন করেছিলেন সবি নিঃশেষ করে ফেলেন।[১৪২]

বাল্যকাল থেকেই কবি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি- অনায়াশেই তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন। কবির কবিতায় তার চারিত্রিকনেতিবাচক দিকটি লক্ষণীয়। তিনি ব্যাঙ্গ কবিতা রচনা করতে খুব ভালোবাসতেন। বহু মান্যবর ব্যক্তিকে তিনি কবিতার মাধ্যমে নাজেহাল করে ফেলতেন। এহেন ঘৃণ্য কাজ কর্মের জন্য পরিবারের লোকজন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। কবি নিদারুণ কষ্টে পতিত হয়ে পরিবারের নিকট এ শর্ত করেন যে, তিনি আর কোনো অন্যায় কাজ করবেন না। তাকে যেন পরিবারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তার চাচারা তাকে তাদের নিকট স্থান দেন। অল্প কিছুদিন পরই তার মাকে তার চাচারা প্রাপ্য সম্পদ না দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন।[১৪৩]

অতঃপর আরবের ঐতিহাসিক বাসুস যুদ্ধ যখন শুরু হয় কবি তখন বানু বাকর গোত্রের পক্ষে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রতিপক্ষ তার মায়ের গোত্র বানু তাগলিব। কবি এ যুদ্ধে

---

১৪১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
১৪২.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। এ যুদ্ধে তিনি প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী হন এবং আবার উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ফিরে যান ও এক পর্যায়ে নিঃস্ব হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাবাদের আশ্রয়ে পরিবারে ফিরে আসেন।[১৪৪]

কবি ভ্রাতা মাবাদের উট চড়ানোর কাজ নেন। একদা চারণভূমিতে উট ছেড়ে দিয়ে কাব্য রচনায় মগ্ন হয়ে যান। এই ফাঁকে মুদার গোত্রের লোকজন উটগুলো ধরে নিয়ে যায়। কর্তব্যে অবহেলার দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। মাবাদ তাকে এ কারণে যার পর নাই তিরস্কার করেন। কবি উটগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য হীরা অধিপতি আমার ইব্ন হিন্দ এবং চাচাতো ভাই মালিকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু চাচাতো ভাই মালিক তাকে উল্টো তিরস্কার করলে কবি তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কাসীদা রচনা করে উপযুক্ত প্রদান করেন। এই কাসীদাটিই আরবী সাহিত্যে এক অনন্য নিদর্শন যা দ্বিতীয় মু'আল্লাকা হিসেবে সুপরিচিত। কবি এ কাসীদায় তার নিকটাত্মীয় আমর ইব্ন মারসাদের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আমর এতে কবির প্রতি খুবই প্রীত হন এবং তাকে ১০০ উট উপহার দেন। এসব উট থেকে তিনি কিছু দ্বারা ভ্রাতৃ ঋণ পরিশোধ করে বাকীগুলো নিজের কাছে রেখে দেন। এক পর্যায়ে আবার সম্পদশূণ্য হয়ে পড়েন।[১৪৫]

এ সময় তিনি তার মামা কবি মুতালাম্মিসসহ ভাগ্যন্নোয়নে হীরা অধিপতি আমর ইব্ন হিন্দের দরবারে উপস্থিত হন। আমর তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে রাজদরবারে স্থান দেন এবং যুবরাজের শিক্ষার কাজে তাদের নিয়োজিত করেন। ফলে রাজ পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায়। কিন্তু কবি তারফা ব্যাঙ্গ কবিতার মোহ থেকে বের হতে পারেননি।তিনি আমর ইব্ন হিন্দের প্রশাসকদের মধ্য থেকে

---

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

অনেকের বিরুদ্ধে হিজা কবিতা রচনা করেন। এমনকি একদিন নেশাগ্রস্থ অবস্থায় স্বয়ং আমরের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গ কবিতা রচনা করেন।

আমর খুব বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তিনি সরাসরি এর প্রতিশোধ নেননি কৌশলে মামা - ভাগ্নে দুজনেই পত্র মারফত বাহরাইন পাঠিয়ে দেন এই বলে যে, সেখান শাসনকর্তা মুকাবীর তাদেরকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করবেন। মুতালাম্মিসের সন্দেহ হয় তিনি চিঠি খুলে এক বালককে দিয়ে পড়িয়ে বুঝতে পারেন যে তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু কবি তারফা এটি বিশ্বাস না করে বাহরাইন গমন করেন এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে কবির বয়স হয়েছিল ২০ বছর মতান্তরে ৩০, মতান্তরে ৪০ বছর। তবে তাঁর বোন খারনাকের মতে বয়স হয়েছিল ২৬ বছর।[১৪৬]

অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করলেও তার রচিত কাসীদা তাকে অমর করে রেখেছে। তাঁর কাসীদার সাহিত্যিক মান নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ তাকে জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে ইব্ন রশীক আল-কায়রোয়ানী ও ইব্ন সুক্কারীর নাম প্রণিধানযোগ্য। কবি লাবীদ ইব্ন রাবীয়াহর মতে ইমরুউল কায়েসের পরেই তারফার অবস্থান।[১৪৭]

কাসীদা ছাড়াও তার অন্যান্য কবিতা সংরক্ষিত হয়েছে। তার দীওয়ান লন্ডন থেকে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অতঃপর এটি কায়রো, বৈরুত, প্যারিস, বার্লিন, ইস্তাম্বুল

১৪৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২
১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

ও কলকাতা থেকে বহুবার মুদ্রিত হয়। কবির বেশির ভাগ কাব্য আরবী অলঙ্কারের মানদন্ডে উত্তীর্ণ। তার কাব্যের নমুনা নিম্নরূপ:

انا الرجل الضرب الذى تعرفونه + حشاش كرأس الحية المتوقد
فليت لا ينفق كشحى بطانة + لعضب رقيق الشفر تين مهند

আমি একজন কৃশকায় দুরন্ত ব্যক্তি, যাকে তোমরা দুঃসাহসী বলে জান
(কোন কাজে) যার ক্ষিপ্রতা উজ্জল সর্প-ফনা তুল্য।
আমি শপথ করেছি যে, আমার কটিদেশ কখনও তীক্ষ্ণ
ও উভয় দিক সমান শানিত ভারতীয় কৃপাণ হতে শূন্য থাকবে না।[১৪৮]

যুহাইর ইব্ন আবীসুলমা (মৃ. ৬০৯ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম যুহাইর ইব্ন আবী সুলমা রবিয়াহ ইব্ন রিবাহ আল-মুযানী। কবির বানু মুযায়না বংশোদ্ভূত ছিলেন।[১৪৯] কবি মুযায়না গোত্রের অন্তর্গত হলেও তাঁর জন্ম ও লালন পালন হয় বানু গাতফান গোত্রে। কবির বড় বোনের নাম সুলমা। এদিকে লক্ষ্য করে তার পিতাকে আবু সুলমা উপনামে অভিহিত করা হয়।[১৫০]

শৈশবে কবি পিতৃহারা হন। তার মামা ছিলেন বানু গাতফানের প্রভাবশালী ব্যক্তি বাশামা ইবনুল গাদীর। বাশামার অনন্য সাধারণ বিচক্ষণতার জন্য বানু গাতফান কোনো যুদ্ধে গমন করলে তার সাথে সাক্ষাৎ করে মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করতো এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে গনীমতের মালের একটি অংশ তাকে প্রদান করতো। বাশামা নিঃসন্তান

---

১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
১৪৯. শাওকী দায়ফ, পৃ.৩০০
১৫০. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

ছিলেন সেই সাথে অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি তার ভাগ্নেকে পিতৃস্নেহে লালন পালন করেন। বাশামা একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা তার মামার নিকট থেকে কাব্য সম্পদ এবং অর্থ সম্পদ দুটোই লাভ করেন। সেই মহান বাশামা চরিত্র মাধুরিমাও তিনি লাভ করেন।[১৫১]

কবি প্রথমে উম্মে আউফা নামী এক মহিলাকে বিয়ে করেন অতঃপর এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। তবে কবির কাব্যের পরতে পরতে প্রথম প্রণয়ীর সুরভিত পরশ আমরা বারবার লক্ষ করি। তিনি উম্মে আউফাকে নিয়ে বহু পঙক্তি রচনা করেছেন। কবি যুহাইরকে অনেকে খ্রিস্টান বলে অভিহিত করেছেন। তবে তার কাব্যের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি মহান আল্লাহ, পরকাল, পুনরুত্থান ইত্যাদির উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। এই হিসেবে অনেকেই তাকে দীনে হানীফের অনুসারী সাব্যস্ত করেন।[১৫২]

কবি যুহাইর স্বভাব কবি ছিলেন না কিন্তু কাব্য চর্চার মধ্য দিয়ে এমন স্থানে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন সমকালে তিনিই ছিলেন আরবী কবিতার প্রাণপুরুষ। তার পরিবার ছিল কাব্য চর্চার শুতিকাগার। তার দুই বোন সুলমা ওআল-সালমা কবি ছিলেন। তার দুই ছেলে বুজাইর ও কা'ব স্বনামধন্য কবি ছিলেন। তার পৌত্র উকবা ইব্ন কাব ও প্রপৌত্র সাওয়াল ইব্ন উকবা সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ছিলেন।[১৫৩]

কবি যুহাইর ছিলেন মানবতাবাদী কবি। শান্তির স্বপক্ষে তিনি জয়গান গেয়েছেন। যুদ্ধ অশ্লীলতা, উন্মত্ততা ইত্যাদি থেকে তিনি নিজে গুটিয়ে রেখেছেন। কাব্য ক্ষেত্রে তিনি নতুনত্ব নিয়ে আসেন। তার কাব্যে নীতি নৈতিকতা বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রেয়সীর অশ্লীল বর্ণনায় তিনি যাননি, উন্নত নৈতিক চরিত্র মাধুরিমার কথাই তার কাব্যে ফুঠে

---

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৯
১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

উঠেছে। দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) তাকে সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিহিত করেছেন।[১৫৪] সাহিত্য সমালোচকরা তার সম্পর্কে বলেছেন,'কবিদের মধ্যে তিনিই স্থূলতা ও বিচ্যুতি হতে সবচেয়ে বেশি মুক্ত ছিলেন।'[১৫৫] তাঁর কবিতা আরবী অলঙ্কারমন্ডিত ছিল। অলঙ্কার শাস্ত্র বিকাশে তাঁর কবিতা একটি অনন্য নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর কাব্যের নমুনা নিম্নরূপ:

وما ادرى وسوف أخال أدرى + أقوم أل حصن أم نساء

"আমি জানি না, অচিরেই আমি জেনে নিব গোত্রের লোকেরা পুরুষ নাকি নারী ?"

কবি এখানে জানেন যে হিসন গোত্রের লোকেরা পুরুষ তথাপি এটি বলার কারণ হচ্ছে তাদের হেয়-প্রতিপন্ন করা। তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য জেনেও না জানার ভনিতা করেছেন। এটি আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের تجاهل العارف অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।[১৫৬]

লাবীদ ইব্ন রাবীয়াহ (মৃ. ৪১ হি/৬৬১ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম আবু আকীল লাবীদইব্ন রাবীয়াতুল আমিরী। তিনি আরবের ঐতিহ্যবাহী হাওয়াযিন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা ছিলেন তামিরা বিনতু যানবাআ। তিনি ছিলেন আবস গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। কবির জন্ম সাল নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন ৫১৬ খ্রি. কেউ বলেছেন ৫৩০ খ্রি. আবার কেউ কেউ বলেছেন

১৫৪. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, *আল-আগানী* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি), খ. ১০, পৃ. ৩৩৬
১৫৫. ড. মোহাম্দ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
১৫৬. ড. মু.নকিবুল্লাহ, আরবী অলংকার বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

৫৪০ খ্রি. তার জন্ম হয়। তবে তার মৃত্যু সন নিয়ে মত পার্থক্য নেই। তিনি মোয়াবিয়া (রা.) এর যুগে ৬৬১ খ্রি.মৃত্যুবরণ করেন।[১৫৭]

লাবীদ এমন এক পরিবারে জন্ম গ্রহন করেছিলেন যে পরিবার জাহিলী যুগে আরবের শ্রেষ্ঠতম পরিবার হিসেবে পরিগণিত ছিল। তার পিতাকে দানশীলতা ও বদন্যতার জন্য রাবীউল মুকতিরীন বা অসহায়দের বসন্ত বলে অভিহিত করা হতো। তার চাচা আবু বারা ছিলেন মুদার গোত্রের খ্যাতিমান অশ্বারোহী বীর সেনানী। দানশীলতা ও বীরত্ব এই দুটি গুণ তার পরিবারকে বিভূষিত করেছিল।[১৫৮]

পরিবারের ঐতিহ্য তার মাঝে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ছিলেন পরিশুদ্ধ মানুষ ও বীর পুরুষ । তিনিই প্রথম অশ্বারোহী বীর কবি হিসেবে স্বীকৃত। শৈশব থেকেই তাঁর মাঝে কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। একবার কবি নাবিগার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। নাবিগা তাকে দেখে বলেন তোমার দুচোখে কবি কবি দৃষ্টি লক্ষ করা যাচ্ছে। তুমি কাব্য রচনা করতে পারো? লাবিদ তক্ষণাৎ দু'পঙক্তি কবিতা রচনা করে তাকে শুনালেন। এতে মুগ্ধ হয়ে কবি নাবিগা তাকে বললেন যাও তুমি কেবল আমির বা হাওয়াযিন গোত্রেরই কবি নও বরং গোটা আরবের সেরা কবি।[১৫৯]

কবি লাবিদের গোত্র বানু আমির ও তার মাতুল গোত্র বানু আবসের মধ্যে শত্রুতা ছিল। বানু আবসের সর্দার রাবী ইব্ন যিয়াদ হীরা অধিপতি তৃতীয় নোমানের নিকট বানু

---

১৫৭. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*,, পৃ.৯০; মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০; ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১১
১৫৮. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২
১৫৯. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-৩১৪

আমিরের বিরুদ্ধে কুৎসা করেন। এতে নোমান বনু আমিরের প্রতিনিধি দলের সাথে ভালো আচরণ করেননি।[১৬০]

[

বনু আমিরের সর্দার ছিলেন কবির চাচা আবু বারা। কবি পরবর্তী প্রতিনিধি দলের সাথে নোমানের দরবারে যেতে চাইলেন। তিনি বলেন আমি রাবী ইব্ন যিয়াদকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করব যে, সে জীবনে মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না। তার পীড়াপীড়িতে তার চাচা তাকে প্রতিনিধি দলের সাথে নিতে সম্মতি দেন। তিনিও তার কথা রক্ষা করেন। অর্থাৎ এমন এক কাসীদা সেখানে আবৃত্তি করেন যে, বাদশা নোমান আমির গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেন।[১৬১]

ইসলাম গ্রহণের পর খুব কমই তিনি কবিতা রচনা করেছেন। এ সময় তিনি ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) একবার তাকে কবিতা আবৃত্তি করতে বললে তিনি সূরাহ বাকারা পাঠ করেন। সেই সাথে বলেন আল্লাহ আমাকে সূরাহ বাকারা ও আল-ইমরান শিক্ষাদানের পর কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন বোধ করিনা। খলীফা সন্তুষ্ট হয়ে তার ভাতা ২,০০০ থেকে ২,৫০০ দিরহাম করেন।[১৬২]

আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (মৃ. ৬১৫)

তার প্রকৃত নাম আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আমর ইব্ন মুআভিয়া ইব্ন ফুওয়াদ ইব্ন মাখযুম ইব্ন রাবীয়া। উপনাম আবুল মুগাল্লিস ও আবু আওফা। তিনি ছিলেন অসাধারণ বীরপুরুষ এজন্য তাকে আনতারাতুল ফাওয়ারিস নামে অভিহিত করা হতো। তার নীচের

---

১৬০. মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
১৬২. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

ঠোঁট কর্তিত ছিল বলে তাঁকে আনতারাতুল ফালহা বলা হতো। তাঁর গায়ের রং ছিলো কালো কুচকুচে-এজন্য তাকে আগরিবাতুল আরাব নামে অভিহিত করা হতো।[১৬৩]

তাঁর পিতা শাদ্দাদ ছিলেন আবস গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি কোনো এক যুদ্ধে তাঁর মাতা যাবীবাহা বন্দী করে নিয়ে আসেন এবং দাসীরূপে ব্যবহার করেন। কবির জন্মসাল আনুমানিক ৫২৫ খ্রি.। সেকালে দাসীর পুত্র বংশ পরিচয় পেতনা সে দাস হিসেবেই গণ্য হতো। আমরাও দাসীর সন্তান ঐ ক্রীতদাস হিসেবেই বড় হতে থাকেন। কালো গাত্রবর্ণ ও দাসীর সন্তান হিসেবে তিনি নিজ পরিবারে অত্যন্ত নিগৃহীতভাবে বেড়ে উঠতে থাকেন। তার বাবা, চাচা ও চাচাতো ভাইয়েরা তাকে কোনো সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করতো না। আনতারা নিজ যোগ্যতায় অনন্য সাধারণ কুশলী বীর হয়ে উঠেন। সঙ্গত কারণে তিনি তার গোত্রের অপরিহার্য অশ্বারোহী বীর সেনানীর অভিধায় অভিসিক্ত হন। একবার আবস গোত্রের লোকেরা বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাঁর পিতা তাঁকে প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দিলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর তার পিতা তাঁকে বললেন, যাও আক্রমণ কর, তুমি স্বাধীন। তখন তিনি প্রতি আক্রমণ করে শত্রু সৈন্যকে হারিয়ে দেন। এর পরবর্তী দাহিস ও গাবরার যুদ্ধেও তিনি অসাধারণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। একপর্যায়ে তিনি হয়ে উঠেন সমকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বীর সেনানী। কবি ভালোবাসতেন চাচাতো বোন আবলাকে। কিন্তু আবলার পরিবার তাকে পছন্দ করেনি। কবি আজীবন আবলাকে চেয়েছেন। প্রথম প্রেমের সুরভিত পরশ নিয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একজন প্রবাদ পুরুষে পরিগণিত হয়েছেন।[১৬৪]

---

১৬৩. মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১৬৪. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

আনতারা শুধু বীর সেনানী আর প্রেমিক প্রবরই ছিলেন না তার মাঝে বহুবিদ মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। মজলুমের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ, বদান্যতা, সহনশীলতা, অঙ্গীকার পূরণ, বিপদে ধৈর্য ধারণও নির্লোভ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন আনতারা।[১৬৫]

আরবী সাহিত্যে আনতারার শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে তার মু'আল্লাকা। তাঁর দীওয়ানও সংকলিত হয়েছে। তার দীওয়ানে ১৫০০টি পঙক্তি রয়েছে। ১৩১৫ খ্রি.সর্বপ্রথম কায়রো থেকে তা প্রকাশিত হয়। তার কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:

وظل هواك ينمو كل يوم + كما ينمو مشيبى شبابى
عتبت صروف دهرى حتى + فني وأبيك عمرى في العتاب

"ওহে আবলা দিন দিন তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা বাড়তেই আছে, যেমনটি আমার তারণ্যে বার্ধক্যে এগিয়ে যাচ্ছে।
তোমার জন্যেই আমি যুগের নির্মমতাকে ভর্ৎসনা করছি এবং এই ভর্ৎসনাতেই আমার জীবন হারিয়ে গেল।"[১৬৬]

আমর ইব্ন কুলসুম (মৃ. ৬০০ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম আমর ইব্ন কুলসুম ইব্ন আত্তাব ইব্ন সাদ ইব্ন যুহায়র। আমর ইব্ন কুলসুম আরবের বিখ্যাত গোত্র বানু তাগলিবে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন বীর কেশরী কুলসুম ইব্ন আত্তাব। তার মাতার নাম লায়লা। তিনি জাহিলী যুগের অন্যতম

---

১৬৫. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩৬
১৬৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৪০

সেরা বীর কুলায়বের ভাই কবি মুহালহিল ইব্ন রাবীয়াহর কন্যা ছিলেন। বংশীয় আভিজাত্য ও অসাধারণ নেতৃত্বগুণ নিয়ে আমর ইব্ন কুলসুম বড় হয়ে উঠেন।[১৬৭]

বানু তাগলিব ও বানু বাকরের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবত বিবাদ লেগেই ছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত বাসূস যুদ্ধ ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। বাসূস যুদ্ধের শেষের দিকেই কবি আমরের আবির্ভাব। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এরকম একটি সময়ে কবি আমর তার পিতার বীর পুরুষ ও মাতামহের মতো কবি ও নেতৃত্বগুণ নিয়ে বড় হতে থাকেন এবং মাত্র পনের বয়সে তাগলিব গোত্রের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন।[১৬৮]

বানু তাগলিব ও বানু বাকরের সাথে হীরা অধিপতি তৃতীয় মুনযির ইব্ন নোমানের সুসম্পর্ক ছিল। মুনযির উভয় গোত্রকে সন্ধিচুক্তিতে নিয়ে আসেন। ফলে দীর্ঘ ৪০ বছর পর তাদের মধ্যে মিত্রতা ফিরে আসে। মুনযিরের মৃত্যুর পর হীরার শাসন ক্ষমতায় আসে তদীয় পুত্র আমর ইব্ন মুনযির। তিনি আমর ইব্ন হিন্দ নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রজাদের প্রতি সুবিচার করতেন না। তবে তিনি সাহিত্যামোদী ছিলেন। তার দরবারে সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবিগণ যাতায়াত করতেন। এদের মধ্যে তারাফা ইব্ন আব্দ, আমর ইব্ন কুলসুম ও হারিস ইব্ন হিল্লিযার নাম প্রণিধানযোগ্য।[১৬৯]

বানু তাগলিব ও বানু বাকর তার সময়েও শান্তি চুক্তি বজায় রাখে। অতঃপর বানু বকরের নৃশংসতায় বানু তাগলিবের ৭০ জন লোক প্রাণ হারালে পরিস্থিতি আবার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। উভয় পক্ষ আমর ইব্ন হিন্দের দরবারে উপনীত হয় এবং আমর ইব্ন কুলসুম তার রচিত ম'আল্লাকার মাধ্যমে তার বংশের গৌরব ও মার্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট

---

১৬৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৬১
১৬৮. মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৭

হন। তিনি সেখানে মু'আল্লাকা আবৃত্তি করলে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। তার জবাবে বানু বাকরের হারিস ইব্ন হিল্লাযাও তার রচিত মু'আল্লাকা পাঠ করেন।[১৭০]

কবি আমর যেমন ছিলেন সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সমর কুশলী তেমনি প্রচন্ড আত্মসম্ভ্রমের অধিকারী। হীর অধিপতি আমর ইব্ন হিন্দ কৌশলে তাঁকে এবং তাঁর মাকে দাওয়াত করে রাজ প্রাসাদে নিয়ে যায়। সেখানে পরিকল্পনামতো হীরা অধিপতির মা কবির মাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কবির মাতা কবিকে উক্ত বিষয়টি জানালে কবি সাথে সাথে আমর ইব্ন হিন্দকে হত্যা করে তাঁর মাকে নিয়ে তার গোত্রে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন।[১৭১]

মু'আল্লকা ছাড়াও ২৪টি কবিতা সম্বলিত তার দীওয়ান সংরক্ষিত আছে। তার কবিতা সমূহ আরবী অলঙ্কারের অনন্য নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত। তার কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:

صبنت الكاس عنا ام عمرو + وكان الكاس مجراها اليمينا

وما شر الثلاثة ام عمرو + بصاحبك الذى لا تصبحينا

"হে উম্মে আমর! পানপাত্র দক্ষিণ দিক হতেই পরিবেশন করা হয়, কিন্তু তুমি তা আমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ।

হে উম্মে আমর! তোমার সেই দুহৃদ, যাকে তুমি প্রাত: সুরা পান করতে দিচ্ছ না (সর্বাগ্রে) সে ঐ তিন জনের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নয়।[১৭২]

আল-হারিস ইব্ন হিল্লিযা (মৃ.৫৭০ খ্রি.)

---

১৭০. প্রাগুক্ত

১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

১৭২. মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

তার প্রকৃত নাম আবু যলীম আল-হারিস ইব্ন হিল্লিযা ইব্ন মাকরুহ ইব্ন ইয়াযিদ। তিনি হীরা অধিপতি আমর ইব্ন হিন্দের সমসাময়িক ছিলেন। এ হিসেবে তিনি খ্রিস্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আল-আসমায়ীর মতে তিনি যখন হীরার রাজ দরবারে তার মু'আল্লাকা আবৃত্তি করেন তখন তার বয়স হয়েছিল ১৩৪ বছর। কারো কারো মতে তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেণ।[১৭৩]

আল-হারিস ইব্ন হিল্লিযা বানু বাকর গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহৎ চরিত্র, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, ভদ্র, বিনয়ী ও শালীন ব্যক্তি হিসেবে জাহিলী যুগে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[১৭৪]

বানু বাকর ও বানু তাগলিব গোত্র দীর্ঘদিন যাবত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। এক বাসূস যুদ্ধই ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। অতঃপর হীরা অধিপতি তৃতীয় মুনযিরের হস্তক্ষেপে তা সমাপ্ত হয়। উভয় গোত্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়। তৃতীয় মুনযিরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমর ইব্ন হিন্দ উভয় গোত্রের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখেন। একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনায় বানু তাগলিব গোত্রের ৭০ জন লোক মারা গেলে আবার তাদের মধ্যে অশান্তি দেখা দেয়। উভয় গোত্র হীরার রাজদরবারে গমন করে এবং সেখানে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষে সাফাই পেশ করে। বানু তাগলিব গোত্রের সরদার ছিলেন কবি আমর ইব্ন কুলসুম। তিনি সেখানে বানু তাগলিবের পক্ষে তার বিখ্যাত মু'আল্লাকা উপস্থাপন করলে আমর ইব্ন হিন্দ তার খুব প্রশংসা করেন। দরবারে বানু তাগলিবের মর্যাদা সমুন্নীত হয়। আর বাকর গোত্রের নেতা নোমান ইব্ন হারিম সেখানে অপদস্ত হন। বানু বাকরের প্রতিনিধি দলের সানে আল-হারিসও ছিলেন। তিনি এর

---

১৭৩. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৮৬
১৭৪. প্রাগুক্ত

প্রতিবাদ জানানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বাদশাহ তার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতেন না। সেখানে তার ও বাদশার মাঝে সাতটি পর্দা দেয়া থাকতো। অতঃপর গোত্রের পক্ষে তিনি তার মু'আল্লাকা সেখানে উপস্থাপন করেন। এতে দরবারের অবস্থা পাল্টে যায়। বাদশাহ, তার মা হিন্দ ও দরবারী লোকজনের প্রচুর প্রশংসা তিনি লাভ করেন এবং বানু বাকরের হৃত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনেন।[১৭৫]

আল-হারিসের মু'আল্লাকা ব্যতীত তেমন কোনো কবিকর্ম পাওয়া যায় না। তার কিছু ক্ষুদ্র কীর্তি আবুল ফারাজ আল-ইসপাহানীর আল-আগানীতে পাওয়া যায়। আল-হারিস ছিলেন প্রথম শ্রেণির কবি তবে মু'আল্লাকা ভুক্ত কবি গণের মধ্যে তাঁর অবস্থান সপ্তম। তাঁর মু'আল্লাকাটি ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী। এর পঙক্তি সংখ্যা ৮৪টি।[১৭৬]

তাঁর কাব্যের নমুনা:

لا تخلنا على غراتك إنا + قبل ما قد وشى بنا الأعداء

فبقينا على الشنائة تنمينا + حصون وعزة قعساء

قبل ما اليوم يبضت بعيون + الناس فيها تغيظ واياء

"তুমি মনে করো না যে, আমরা তোমার মিথ্যা প্ররোচনায় ভীত হয়ে পড়েছি। কারণ এর পূর্বেও আমাদের বহু শত্রু (আমাদের বিরুদ্ধে) কুৎসা রটনা করেছে।

তাদের হিংসা সত্ত্বেও আমরা উন্নত (শির) ছিলুম, বংশ মর্যাদা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে (আজও) আমাদের স্থান বহু উচ্চে।

পূর্বেও অনেকে আমাদের গৌরব ও ঐশ্বর্যে (হিংসায়) অন্ধ হয়ে যেতো।

যুগ আমাদের দিকে কৃষ্ণ-গিরি চূড়ার মতো নিক্ষিপ্ত হলেও মেঘমালা তাকে বিপদ মুক্ত করে দেয়।[১৭৭]

---

১৭৫. মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৮

১৭৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১

১৭৭ . মুহাম্মদ মতিউর রহমার, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের ক্রমবিকাশঃ ইসলামী যুগ

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ: ইসলামী যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামী যুগ : পরিচিতি ও পরিধি

আরবী সাহিত্যে ইসলাম পূর্ব যুগকে জাহিলী যুগ বলা হয়। আর জাহিলী যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ৬১০ ক্রিস্টাব্দে যখন রাসূলুল্লাহ (স.) নবুওয়ত প্রাপ্ত হন। এ হিসেবে ইসলামী যুগ হচ্ছে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। অনেক গবেষক একে ইসলামের প্রাথমিক যুগ বলে অভিহিত করেছেন।[১৭৮]

এ যুগের মধ্যে রয়েছে মহানবী (স.) এর মাক্কী জীবন, হিজরত, মাদানী জীবন ও তাঁর তিরোধান, আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), ওসমান ইব্ন আফফান (রা.), আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) ও হাসান ইব্ন আলী (রা,) এর খিলাফতকাল। ৪০হি./৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মহান খিলাফতের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে এ যুগের যবনিকা ঘটে।

এ যুগ আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে অবতীর্ণ হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম। এ গ্রন্থ অবতরণের সাথে সাথে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব সাধিত হয়। পবিত্র কুরআনের ভাষাশৈলী অবলোকন করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় বোদ্ধামহল। সাহিত্যে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনের প্রভাবে নতুন নতুন শাস্ত্র সৃষ্টি হতে থাকে। কুরআনে ব্যবহৃত অলঙ্কারপূর্ণ বাচনভঙ্গি, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, আমছাল সেই সাথে চিত্তাকর্ষক শব্দ, অভিনব বাচনভঙ্গি, অনন্য সাধারণ বাক্যবিন্যাস নতুন রেঁনেসার সৃষ্টি করে। এ যুগের কবি সাহিত্যিকগণ আল-কুরআনের ভাবাদর্শে সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

---

১৭৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনুল কারীম ও ইলমুল বালাগাত

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপর অবতারিত। যা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ বাণী বা কালাম। এটি সকল আসমানী কিতাবের সারনির্যাস। এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। পবিত্র কুরআন মহানবী (স.) -এর ৪০ বছর বয়স থেকে পরবর্তী দীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপীপ্রয়োজনমতো অবতীর্ণ হতে থাকে। জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (স.) -এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন এবং মহানবী (স.) সাথে সাথে তা মুখস্থ করে নিতেন। অতঃপর তিনি কাতেবী ওহী তথা ওহী লেখক সাহাবীদের ডেকে কাগজ, চামড়া অথবা হাড়ে অবতারিত আয়াত অথবা সূরাহ লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর নির্দেশ তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হতো। সে সময় এমন একটা পরিবেশ ছিল সাহাবায়ি কিরাম অপেক্ষায় থাকতেন কখন কোন নির্দেশ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে। আর যখনই অবতীর্ণ হতো কোন সূরাহ অথবা আয়াত সাথে সাথে তাঁরা তা মুখস্থ করতে এবং প্রচার করতে সারাক্ষণই প্রচেষ্টা চালাতেন।

এভাবে অসংখ্য সাহাবী পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে নেন। মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীরা সাধারণ সালাতে এবং তাহাজ্জুদ সালাতে নিয়মিত কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন এবং তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। তাঁরা সালাতে পুরো কুরআন মাজিদ পাঠ করতেন। অনেক সাহাবী তিন থেকে সাত রাত্রিতে কুরআন মাজিদ খতম করতেন। কেউ আরো একটু বেশি সময় নিয়ে যেমন ৩০দিন অথবা ৪০ দিনে খতম করতেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁদের নিকট অন্যতম আনন্দময় ও তৃপ্তিময়

ইবাদাত। এভাবে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মুমিনদের হৃদয়ে মুখস্থ রেখে ও নিয়মিত সালাতে খতমের মাধ্যমে কুরআনকে অবিকল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজে নিয়েছেন এবং সেটা তিনি বাস্তবে মানবজাতিকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআন অবতরণের একটি দিক হলো আল্লাহ ও মহানবী (স.)- এর মাঝখানে এমন কোনো মাধ্যম নেই যাতে এমন সন্দেহ থাকতে পারে যে, দুর্বলতার অবকাশের সুযোগ আছে। কেননা, মহানবী (স.) -এর নিকট কখনো কখনো সরাসরি প্রত্যাদেশ হয়েছে কখনো জিব্রাঈল (আ.), কখনও ইস্রাফিল (আ.) ওহী নিয়ে আসতেন ফলে এ রকম কোনো চিন্তার উদ্রেক হওয়ার সুযোগ নেই যে, মানবীয় দুর্বলতা হেতু কারো সমস্যা হতে পারে। কেননা, ওহী পৌঁছানোর মাধ্যম কোনো মানুষ ছিলেন না।

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন নাযিলের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. ঘন্টাধ্বনির ন্যায়

অধিকাংশ সময় মহানবী (স.) -এর নিকট এ পদ্ধতিতে কুরআন নাযিল হতো। পাথরের উপর পাথরের আঘাত পড়লে যে রকম শব্দ হয় এ পদ্ধতিতে সে রকমই শব্দ হতো আর এ রকম শব্দকেই صلصلة الجرس বলা হয়। কেউ কেউ এটাকে ফেরেশতাদের পাখার মর্মর শব্দ বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসটি প্রধিানযোগ্য:

عن ابي هريرة يقول ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا قضي الله الا مر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة علي صفوان-

‘‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ যখন আসমানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশের প্রতি বিনয়াবনত হয়ে পাখা নড়তে থাকেন। তা যেন পাথরের ওপর শিকলের আঘাত বলে মনে হয়।”[১৭৯]

এ পদ্ধতিতে মহানবী (স.) -এর খুব কষ্ট অনুভূত হতো। তাঁর কর্ণকুহরে এ ঘন্টা ধ্বনি প্রবেশের পর তিনি আর কোনো কিছু শুনতেন না। কঠিন শীতের সময়েও তাঁর কপাল থেকে প্রচুর ঘাম ঝরে পড়তো।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন:

“ওহীর এ পদ্ধতিকে ঘন্টাধ্বণির সাথে উপমা দেয়ার কারণ হচ্ছে, ঘন্টাধ্বণি যেমন একাধারে আসতে থাকে অনুরূপভাবে ওহীর শব্দও একাধারে বিরতিহীনভাবে আসতে থাকে। কিন্তু মানবীয় ধ্বনি এর ব্যতিক্রম। কেননা, তার মধ্যে বিরতি আছে। অপরদিকে ঘন্টা যখন একাধারে বাজতে থাকে তখন শ্রবণকারী ব্যক্তির পক্ষে তার দিক নির্ণয় করা কষ্টকর হয়। কেননা, এটি চর্তুদিক থেকে আসতে থাকে। এমনিভাবে ওহীর ধ্বনিও সকল দিক থেকে আসতে থাকে। মূসা (আ.) যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা‘আলার কালাম শুনতেন তখন তা সকল দিক থেকেই শুনতেন। প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করা ছাড়া এ ধ্বণির সঠিক উপলব্ধি হতে পারে না। এজন্য বিষয়টিকে সহজ করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (স.) এটাকে ঘন্টাধ্বণির সাথে তুলনা করেছেন। এ শব্দ আল্লাহ তা’আলার নিজের শব্দ। অন্য কারো শব্দ নয়। এ শব্দ আল্লাহ পাকের আরশের উপর থেকে শুরু হয়। আর এর পরিসমাপ্তি লাভ করে নবী করীম (স.) -এর নিকট পৌঁছে।”[১৮০]

২. জিব্রাঈল (আ.) এর মানুষ্য আকৃতিতে আগমন

---

১৭৯ . ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩২

১৮০ . ড.মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

জিব্রাঈল (আ.) কখনও কখনও মানুষের আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন। তিনি সাধারণত সাহাবী দেহইয়াহ কালবী (রা.) এর আকৃতিতে আসতেন। আবার কখনোকখনো অপরিচিত কোন ব্যক্তির আকৃতিতে আসতেন। এ পদ্ধতিতে ওহী অবতরণ মহানবী (সা.) এর জন্য অনেকটাই সহজতর ছিল।

৩. ফেরেশতার আপন আকৃতিতে আগমন

কখনো কখনো জিব্রাঈল (আ.) তাঁর আসল আকৃতিতে মহানবী (স.) -এর নিকট প্রকাশ পেতেন এবং তাঁর নিকট ওহী অবতরণ করতেন। এরূপ ঘটনা মহানবী (স.) -এর জীবনে মাত্র তিন বার ঘটেছে। একবার মহানবী (স.) জিব্রাঈল (আ.) কে আপন আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, দ্বিতীয়বার মিরাজের রাত্রিতে, তৃতীয় বার নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে। [১৮১]

৪. সত্য স্বপ্ন

মহানবী (স.) এর নিকট ওহী অবতরণের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে সত্য স্বপ্ন। তাঁর নিকট ওহীর সুচনা হয়েছিলো এ পদ্ধতিতে। কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি যা স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সত্যে পরিণত হতো।

৫. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী লাভ

কোনো কোনো রাসূল মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন, এক্ষেত্রে মূসা (আ.) এর নাম সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। মহানবী (স.) জাগ্রত অবস্থায় মিরাজের রাতে মহান আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। আবার ঘুমন্ত অবস্থাতেও তিনি আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলেছেন।

---

১৮১. *প্রাগুক্ত*

৬. অন্তরে নিক্ষেপ করা

জিব্রাঈল (আ.) কোনো কোনো সময় মহানবী (স.) -এর নিকট উপস্থিত হতেন না। তিনি মহানবী (স.) -এর অন্তরে ওহী প্রেরণ করতেন।

৭. ওহীয়ে ইসরাফিল (আ.)

কখনো কখনো জিব্রাঈল (আ.) না এসে হযরত ইসরাফিল (আ.) ওহী নিয়ে আসতেন। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (স.) -এর নিকট ওহী আসার সাথে সাথে তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন এবং ওহী লেখকদের ডেকে তা লিখিয়ে নিতেন। সাহাবীরা ও তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। এভাবেই চলছিল মহানবী (সা.) এর যুগ পর্যন্ত। অতঃপর আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে একত্রিত করা আবশ্যকীয় হয়ে উঠলো।

কুরআন মাজিদ একত্রিকরণঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পবিত্র কুরআন দু'ভাবে একত্রিত করা হয়েছে। **এক.**মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করার মাধ্যমে; **দুই.** লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে। উভয় বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে শুধু গ্রন্থাকারে একত্রিত করার বিষয়টি আলোচনা করা হবে। মহানবী (স.) -এর তিরোধানের পর ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব আবু বকর (র.) -এর হাতে ন্যাস্ত হয়। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর উপর বেশ কয়েকটি মুসিবত একযোগে আপতিত হয়। এর মধ্যে কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। কিছু লোক ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয় যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে। আবার ভন্ডনবীদের উৎপাত বেড়ে যায়। এসকল ফিৎনা উৎখাতে আবু বকর (রা.) কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে যুদ্ধের ময়দানে এর ফয়সালা হয়। শেষ পর্যায়ে এসকল ফিৎনা নির্মূলে তিনি সক্ষম হন। ভন্ড নবী মুসায়লামাতুল কায্যাবের সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে

যুদ্ধে মুসায়লামা নিহত হয় এবং তার অনুসারীরা পরাজিত হয়। এ ফিৎনা এখানে নির্মূল হলেও মুসলিম উম্মাহর চরম মূল্য দিতে হয়। এ যুদ্ধে ৭০ জন হাফিজে কুরআন শাহাদাৎ বরণ করেন। কারো কারো মতে পাঁচশতজন হাফিজে কুরআন এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[১৮২] এ ঘটনায় ওমর ইব্ন ুল খাত্তাব (রা.) বিচলিত হয়ে উঠেন। তার মনে এ বিষয়টি রেখাপাত করে যে, শুধু হাফিজে কুরআনদের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ রাখা ঝুকিপূর্ণ। কাগজের পাতায় সংরক্ষণের মাধ্যমে কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা অধিক নিরাপদ। এ প্রেক্ষিতে তিনি বিষয়টি আবু বকর (রা.) কে অবহিত করেন। আবু বকর (রা.) কিছুদিন চিন্তা-ভাবনার পর এতে সম্মতি প্রদান করেন। এ সম্পর্কে যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.) বর্ণিত হাদীসখানা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

"যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হলো সে সময় আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন; ওমর ইব্ন ুল খাত্তাব (রা.) তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বলেছে, শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক, আমি আশংকা করছি (ভবিষৎ যুদ্ধে হয়তো আরো হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করবেন) এভাবে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি আপনি কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার নির্দেশ দিন। এর উত্তরে আমি ওমরকে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসুল (স.) করেননি সে কাজ আমি কীভাবে করবো ? ওমর (রা.) উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা হচ্ছে উত্তম কাজ। ওমর (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন। আর আমি এর কার্যকারিতার কল্যাণকর দিক উপলব্দি করতে সক্ষম হলাম। এরপর আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি একজন বিজ্ঞ যুবক। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় নেই। এ ছাড়া তুমি মহানবী (স.) -এর ওহী লেখক

---

১৮২. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন* (দেওবন্দ: কুতুবখানা নামিয়্যা, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৮১

ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান কর এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ কর। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি পাহাড় একস্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে কুরআন একত্রিকরণের নির্দেশের চেয়ে কঠিন হতো না। এরপর আমি আবু বকর (রা.) কে বললাম, আপনি কীভাবে সে কাজ করবেন, যা আল্লাহর রাসূল (স.) করেন নি। আবু বকর (রা.) উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! এটি একটি উত্তম কাজ। আবু বকর (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে ততক্ষণ অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি কুরআন (লিখিত অংশ সমূহ) সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুরের ডাল, প্রস্তর খন্ড এবং লোকদের অন্তকরণ থেকে সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি সূরাহ তাওবার শেষ অংশ আবু খুযায়মা আল আনসারীর (রা.) নিকট থেকে সংগ্রহ করলাম এবং আমি এ অংশ তিনি ব্যতীত আর কারোও কাছে পাইনি। আয়াতটির অর্থ, লক্ষ্য কর! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদেরই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর জন্য দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তার কাম্য। মুমিনদের প্রতি তিনি সহানুভুতিসম্পন্ন ও করুণাময়।" গ্রন্থাবদ্ধ কুরআন আবু বকর (রা.) -এর নিকট গচ্ছিত ছিল। এরপর এ কুরআন ওমর (রা.) এর কাছে গচ্ছিত ছিল। অতঃপর ওমর (রা.) -এর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) -এর কাছে ছিল।"[১৮৩]

যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফিজে কুরআনের শাহাদাতে খলীফাতুল মুসলিমীন প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও শেষে এর অপরিহার্যতা তিনি অনুধাবন করে হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিতকে (রা.) এ কাজে নিয়োগ দিলেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) কুরআন একত্রিকরণে যে মূলনীতি অবলম্বন করেন তা নিম্নরূপ:

---

১৮৩ . মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ১৪৫, ১৪৬

১. কোন ব্যক্তি কুরআন মাজিদের কোন অংশ তাঁর নিকট নিয়ে আসলে প্রথমে তিনি তাঁর নিজের হিফজের সাথে মিলিয়ে দেখতেন। উল্লেখ্য, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) নিজে ভালো হাফিজে কুরআন ছিলেন। সে সাথে মহানবী (স.) -এর দীর্ঘ সোহবত তিনি পেয়েছিলেন। এমনকি ওহী লিখক সাহাবীদের তিনি প্রধান ছিলেন।

২. ওমর ইব্ন ুল খাত্তাবও (রা.) হাফিজে কুরআন ছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁকেও যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) -এর সাথে এ মহতী কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিকট কুরআন মাজিদের কোন অংশ নিয়ে আসতেন তখন তিনিও তাঁর নিজের হিফজের সাথে মিলিয়ে নিতেন।[১৮৪]

৩. কোনো লিখিত আয়াত তখনই গ্রহণযোগ্য হতো যখন দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করতেন যে, এ আয়াতও রাসূলুল্লাহ (স.) -এর সম্মুখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের সাথে এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (স.) -এর ওফাতের বছর তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি তা সাত হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৮৫]

৪. লিপিবদ্ধ এ সকল আয়াত অন্যান্য সাহাবীদের নিকট লিপিবদ্ধ ও সংগৃহীত আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে যাচাই বাছাই করা হতো।

এ সহিফার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) কর্তৃক গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এ সহিফার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. এ সহিফার প্রত্যেক আয়াত সে ভাবেই সজ্জিত করা হয় যে ভাবে মহানবী (স.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আয়াতগুলোকে সাজিয়ে ছিলেন। তবে এ সহিফার সুরাহসমূহকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। প্রত্যেক সূরাহ পৃথক পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো।[১৮৬]

---

১৮৪. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উলুমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩
১৮৫ . জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
১৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

২. এ নুসখায় সাত হরফ সন্নিবেশিত ছিলো।

৩. এতে এমন সব আয়াত লিপিবদ্ধ করা হয় যে সকল আয়াতের তিলাওয়াত মানসুখ হয়নি।[১৮৭]

৪. উম্মাহর সকল ব্যক্তি এ নুসখার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। আর এ নুসখার প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সনদে প্রতিষ্ঠিত।[১৮৮]

ওসমান (রা.) -এর যুগে কুরআন মাজিদ একত্রিকরণ

ওসমান (রা.) যখন ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন ইসলাম আরবের সীমানা ছাড়িয়ে রোম ও পারস্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং বিজিত অঞ্চল সমূহে দ্বীনের দাওয়াত চলতে থাকে এবং দলে দলে লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করতে থাকে। দায়ীদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী নও মুসলিমদের কুরআনের তালিম দিতে থাকেন। মহানবী (স.) তাঁর সাহাবীদের বিভিন্ন কিরাত তথা সাত হরফে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ এক কিরাতে কুরআন শিক্ষা নিয়েছেন কেউ বা অন্য কিরাতে কুরআন শিক্ষা নিয়েছেন। ক্বারী সাহাবীদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে সে স্থানে তাঁর কিরাত প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন শামে উবাই ইব্ন কাবের (রা.) তিলাওয়াত, কুফায় আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) -এর তিলাওয়াত প্রসিদ্ধ লাভ করে। এছাড়া অনেকে আবু মুসা আশয়ারী (রা.) -এর তিলাওয়াত পছন্দ করতেন। হরফ উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে ক্বারীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এ বিভেদ কঠিন আকার ধারণ করে। এ সময় একজন শিক্ষক তার পঠন পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। তেমনি অপর শিক্ষক তাঁর নিজস্ব পঠন

---

১৮৭. আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আলামিয়্যাহ, ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৫৩

১৮৮ . *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

পদ্ধতিতে (যা তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন) তাঁর শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা যখন একত্রিত হতো তখন তারা পবিত্র কুরআন পাঠে বিরোধিতায় লিপ্ত হতো। শিক্ষকদের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলে একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতো এমনকি পরস্পর পরস্পরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতো। কারণ এক নের পঠন পদ্ধতি অন্যজনের পঠন পদ্ধতির সাথে মিলতো না। বিষয়টি ওসমান (রা.) জানতে পারেন এবং তিনি এ বিষয়ে ভাষণ দান করে বলেন, তোমরা আমার নিকট মতবিরোধ করছ আর যারা দূরে অবস্থান করছে তারা হয়তো আরো কঠিন বিরোধে লিপ্ত হবে।

হিজায এবং হিজাযের বাইরের মুসলিমদের মাঝে কুরআন মাজিদের পঠন পাঠনে এক বিরাট পার্থক্য দেখা দেয়। লোকেরা যখন কোথাও একত্রিত হতো অথবা যুদ্ধের ময়দানে সমবেত হতো তখন কিরাআতের ইখতিলাফের কারণে পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতো। একে অপরের কিরাআতকে অস্বীকার করতো। এতে করে বিতর্ক সৃষ্টি হতো তা থেকে ঝগড়া-বিবাদ এমনকি রক্তপাতের আশঙ্কা দেখা দিতো। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা যেমনিভাবে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে মতবিরোধ করেছিল তেমনি মুসলমানরাও তাদের পবিত্র গ্রন্থের কিরাআত বিষয়ে এমন মতবিরোধে লিপ্ত হলো যে, তারাও যেন ইয়াহুদী খ্রিস্টনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। এ মতবিরোধের মূল কারণ ছিল সাত হরফে কুরআন মাজিদ সম্পর্কে সকলের জ্ঞান না থাকা। উল্লেখ্য, ক্বারী সাহাবীগণ সাত কিরাআত শিক্ষা না দিয়ে শুধু একটি কিরাতই শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া সকল কিরাআত সম্বলিত কোন মুসহাফ তাদের নিকট মওজুদ ছিল না যা দেখে উদ্ভুত বিরোধের অবসান করা যেত।[১৮৯]

---

১৮৯ . *মানাহিলুল ইরফান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬

উপর্যুক্ত সংকট সমাধানে আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইব্ন আফফান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.) -এর যুগে একত্রিত কুরআন মাজিদের কপি থেকে আরও কপি করে তা বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দিতে হবে। সে সাথে এ নুসখা ব্যতীত অন্যান্য নুসখা বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা কপিও আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।[১৯০] ওসমান (রা.) এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য চারজন বিশিষ্ট হাফিয সাহাবীকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ হলেন, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.), সাঈদ ইব্নুল আস (রা.) ও আব্দুর রহমান ইব্নুল হারিস ইব্ন হিশাম (রা.)। ওসমান (রা.) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) -এর নিকট থেকে আবু বকর (রা.) কর্তৃক একত্রিত কুরআন মাজিদের সহীফাসমূহ চেয়ে নেন। সে সাথে তিনি কুরআন একত্রিকরণ বোর্ডকে এ নির্দেশনা দেন যে, যদি কোন আয়াতের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা কুরায়শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা, কুরআন মাজিদ কুরায়শী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) ব্যতীত বোর্ডের অন্য তিন জন সদস্য কুরায়শী ছিলেন। উপর্যুক্ত বোর্ড ওসমান (রা.) এর নির্দেশনা মোতাবেক সহীফাগুলোকে বিভিন্ন মুসহাফে রূপান্তর করেন। হাফসা (রা.) -এর কপিটি তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ছাড়া কুরআন মাজিদের অন্যান্য সহীফাকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়।[১৯১]

উল্লেখ্য, আমীরুল মুমিনীন ওসমান (রা.) -এর নির্দেশনায় গ্রন্থাবদ্ধ এ মুসহাফটি মুসহাফে ওসমানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহ হযরত ওসমান (রা.) কে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাকে 'জামিউল কুরআন' নামে

---

১৯০. *প্রাগুক্ত*,

১৯১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (করাচি: কারখানা তেজারতে কুতুব, ১৯৬১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৪৬

অভিহিত করা হয়। যদিও কুরআন মাজিদ সর্বপ্রথম একত্রিকরণ করেন আমীরুল মুমিনীন হরযত আবু বকর (রা.)। ওসমান (রা.) আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর নুসখা থেকেই বিভিন্ন কপি করেন এবং সকল পাঠকারীকে একটি কিরাআতের উপর একত্রিত করেন। তিনি আটটি কপি লিপিবদ্ধ করান। এ আটটি কপি থেকে একটি মক্কায়, একটি সিরিয়ায়, একটি বসরায়, একটি কুফায়, একটি ইয়েমেনে, একটি বাহরাইনে ও একটি কপি মদীনায় সংরক্ষিত রাখেন। ওসমান (রা.) কর্তৃক সিরিয়ায় প্রেরিত মুসহাফটি দামিশকের জামে মসজিদে সংরক্ষিত আছে। অপর একটি মুসহাফ ইস্তাম্বুলের রাজকীয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[১৯২]

মুসহাফে ওসমানীর বৈশিষ্ট্য

১. মুসহাফে ওসমানীতে আয়াত লিপিবদ্ধ করার পূর্বে সাহাবীদের (রা.) নিকট পেশ করা হতো। অতঃপর তাঁরা যদি স্বীকৃতি দিতেন এবং আবু বকর (রা.) -এর মুসহাফে আয়াতটি যদি সেভাবেই থাকতো যেভাবে তারা রাসুলূল্লাহকে (স.) তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। সেই সাথে আয়াতটি মানসুখ হয়নি। তখনই আয়াতটি লিপিবদ্ধ করা হতো।

২. এ মুসহাফে একাধিক ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থানে একটি কিরাআত লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন : সূরাহ জুমুআর নবম আয়াতে فامضوا الي ذكر الله এর পরিবর্তে فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩. মুসহাফে ওসমানীতে নুকতা সংযোজন করা হয়নি। এর ফলে একই শব্দই বিভিন্নরূপে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন: সূরাহ হুজুরাতের ষষ্ঠ আয়াতে آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

---

১৯২. ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

আয়াতে فتبينوا শব্দটিতে নুকতা দেয়া হয়নি। এতে শব্দটিকে فتثبتوا ও পড়া যায়।[১৯৩]

ওসমান (রা.) যে সকল অঞ্চলে কুরআন মাজিদের মুসহাফ প্রেরণ করতেন তার সাথে তিনি অভিজ্ঞ তিলাওয়াতকারী হাফেযদের পাঠাতেন। ফলে নুকতা না থাকলেও কুরআন মাজিদ পাঠে কোন সমস্যা হতো না। নুকতা না থাকায় সবকয়টি কিরাআতেই তিলাওয়াত করা সহজ হতো। আর সে যুগে নুকতা প্রদানকে দোষণীয় মনে করা হতো। পরে অনারবদের প্রয়োজনে আরবী বর্ণমালায় নুকতা সংযোজন করা হয়।[১৯৪]

৪. যে সকল ক্ষেত্রে শব্দের রূপ ভিন্ন ভিন্ন সে সব ক্ষেত্রে একটি মুসহাফে একটি রূপ অপর মুসহাফে অন্য একটি রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটা এজন্য করা হয় যাতে দু'টি কিরাআতকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়া যায়। যেমন:

ووصي بها ابراهيم بنيه و يعقوب -

এ আয়াতটি একটি মুসহাফে وصي তাশদীদ সহ অপর মুসহাফকে তাশদীদ ছাড়া اوصي লেখা হয়। এ পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণ ছিল নিম্নরূপ:

ক. একই স্থানে পাশাপাশি দু'টি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে লেখা হলে এ সন্দেহের সৃষ্টি হতো যে, শব্দটি দু'বার দু'ভাবে নাযিল হয়েছে।

খ. একটি কিরাআত মূল কুরআনে অপর কিরাআত পাদটীকায় লেখাও তারা সঠিক মনে করেননি। কারণ এতে কেউ ধারণা করতে পারে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির তাসহীহ। তাছাড়া কোন কারণ ব্যতিরেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া যায় না।[১৯৫]

---

১৯৩ . আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬-২৫৮

১৯৪. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ* (ঢাকা: আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, তা. বি.), পৃ. ১৭

১৯৫ . আব্দুল আযীম আয-যারকানী,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৫. আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -এর মুসহাফে আয়াতসমূহ পর্যায়ক্রমে সাজানো ছিল সূরাহগুলো সাজানো ছিল না। মুসহাফে ওসমানীতে আয়াত এবং সূরাহ উভয়গুলোই পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করা হয়।[১৯৬]

৬. সাহাবায়ি কিরাম কর্তৃক লিখিত মুসহাফে কোথাও কোথাও আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা নাসিখ মানসুখের বর্ণনা থাকলেও মুসহাফে ওসমানীতে কুরআন মাজিদ ছাড়া কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল না।[১৯৭]

ওসমান (রা.) -এর এ মহতী উদ্যোগ সফল হয় এবং মুসলিম উম্মাহ বড় ধরনের একটি ফিতনা থেকে রক্ষা পায়। গোটা জাতি তাঁর এ মহান কর্মকে সাদরে গ্রহণ করে। আর তিনি জামিউল কুরআন অভিধায় অভিষিক্ত হন। পরবর্তী সময়ের একদল ভ্রান্ত লোক তাঁর এ মহান কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা করলে সাহাবায়ি কিরাম এসবের প্রতিবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) -এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আবু বকর আল আসবারী সুয়াইদ ইব্ন গাফালা থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন:

سمعت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يقول : يا معشر الناس! اتقوا الله و اياكم و الغلو في عمثان، و قولكم: حراق مصاحف فوالله ما حرقها الا عن ملأمنا اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم -

আমি আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "হে জনমন্ডলী, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা ওসমান (রা.) সম্পর্কে সীমা অতিক্রম করা থেকে নিজের রক্ষা কর। আর এ মন্তব্য থেকেও বিরত থাক যে, তিনি মুসহাফসমূহের

---

১৯৬. ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
১৯৭. আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

দাহনকারী। আল্লাহর কসম! তিনি তা জ্বালাননি, তবে তিনি আমাদের অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (স.) -এর সাহাবীগণের পরামর্শেই এ কাজ করেছেন।"[১৯৮]

কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর কালাম। এটি মহানবী (স.) -এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং এ দায়িত্বের প্রত্যক্ষ ফলাফল আমরা অবলোকন করেছি। আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণ করেছেন তাঁর বান্দাদের মাধ্যমেই। এ সংরক্ষণ তিনি এমনভাবে করেছেন যাতে কেউ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে না পারে। কুরআন একত্রিকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে কোন ব্যাক্তি এ বিষয়ে একমত হবেন যে, পবিত্র কুরআন সর্বোত্তম বৈষয়িক পন্থায় একত্রিত হয়ে গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহর কর্মপদ্ধতিতো এরকমই যে, স্বাভাবিক ও বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কর্মটিকে গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। কুরআন মাজিদ একত্রিকরণের ধারাবাহিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা'আলারই গায়েবী ইশারা বৈ কিছু নয়। মহানবী (স.) -এর উপর যখনই কুরআন অবতীর্ণ হতো সাথে সাথে তিনি তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন সে সাথে কাতিবে ওহীদের ডেকে লিখিয়ে নিতেন। এভাবে আর কোন আসমানী কিতাব নবী (আ.) কর্তৃক লিখে রাখার ইতিহাস নেই। মহানবী (স.) -এর তিরোধানের পর পর ওমর (রা.) -এর পরামর্শে প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক কুরআন মাজিদ একত্রিত হয়ে যায়। অতঃপর হুযায়ফা ইব্ন ুল ইয়ামান (রা.) -এর পরামর্শে ওসমান (রা.) -এর মহান উদ্যোগ পবিত্র কুরআনকে মানবজাতি গ্রন্থাকারে সজ্জিত অবস্থায় পায় যা আজও আমাদের সামনে উপস্থিত। লাওহে মাহফুজে কুরআন মাজিদ যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই মানবজাতির কাছে গ্রন্থাকারে কুরআন মাজিদ সংরক্ষিত আছে। এটি মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও দয়ার ফলেই হয়েছে।

---

১৯৮ . ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর আল-কুরআনের প্রভাব

পবিত্র কুরআন অবতীর্ন হওয়ার পর গোটা আরববাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য তাদেরকে বিমোহিত করে। অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা পবিত্র কুরআনে এত বেশি পরিমানে ব্যবহার করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন পাঠের সময় এর গতি, মাধুর্য, রস ও ঝঙ্কার পাঠককে নাড়া দিতে থাকে। এ সম্পর্কে ড. গোলাম মাওলা বলেন, " আল-কুরআন এমন একখানা কিতাব , যার আয়াতগুলো স্পষ্ট অর্থবোধক এবং বাক্যগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত, যার ভাষার বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা সৌন্দর্যমুগ্ধ করেছে সকলকে, যার অলৌকিকতা খ্যাতনামা আরব ভাষাবিদদেরকে নির্বাক করে দিয়েছে। কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার আয়াতসমূহে রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গভীর মর্ম। বাস্তব ও রূপকের সমাহার। যার সুরাহগুলোর প্রারম্ভ পরিসমাপ্তির সৌন্দর্যের নযীর দূর্লভ, যার বিন্যাসশৈলি সুসমন্বিত।এর শব্দাবলি ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআনের অলৌকিকতা হলো এর অনন্য রচনাশৈলী, যা আরবদের বাচনভঙ্গি হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কুরআনে গদ্য ও পদ্যের মধ্যবর্তী এমন একটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক বাক্য রীতির অনুসরণ করা হয়েছে, যা ছিল আরবের ভাষাবিদদের সম্পূর্ণরূপে চিন্তা বহির্ভূত। কুরআনে যেভাবে ছেদ, অন্তমিল ও চলমান গতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেভাবে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমাপ্তি টানা হয়েছে এবং যেভাবে একটি আয়াতকে অপর একটি আয়াত হতে পৃথক করা হয়েছে, তা আসলেই মুজিযার অন্তর্ভূক্ত।"[১৯৯]

---

১৯৯. ড. মোঃ গোলাম মাওলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) এর হাদীস ও আরবী অলঙ্কার

ওহী দুপ্রকার। ওহীয়ে মাতলু ও ওহীয়ে গাইরে মাতুল। ওহীয়ে মাতলু হচ্ছে সরাসরি ওহী বা প্রত্যাদেশ। আল কুরআনুল কারীম ওহীয়ে মাতলু। আর ওহীয়ে গাইরে মাতলু যা সরাসরি প্রত্যাদেশ নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা যা তিনি মহানবী (স.) -এর উপর নাযিল করতেন আর তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীদের বলতেন, শিক্ষা দিতেন, মুখস্থ করাতেন এবং লিখাতেন। কুরআন মাজিদে প্রথম প্রকার ওহীকে কিতাব ও দ্বিতীয় প্রকার ওহীকে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ-

"আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল সা. প্রেরণ করেছেন, তিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল।"[২০০]

ওহীয়ে গাইরে মাতলুর অপর নাম হাদীস বা সুন্নাত। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় এ প্রকার ওহী এ নামে সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে। হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ, কথা, বাণী, নতুন বিষয়।[২০১] ইসলামী শরীয়াহর পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (স.) -এর

---

২০০. আল-কুরআন, ৩ : ১৬৪

২০১ . ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, ২য় প্রকাশ, পৃ. ১৩১-১৩৪

কথা, কাজ ও অনুমোদন বা মৌন সম্মতিকে হাদীস বলে। রাসূলুল্লাহ (স.) মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশের আলোকে যা বলেছেন, করেছেন এবং অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয়।[২০২] মুহাদ্দিসগণের মতে, যে কথা, কাজ ও অনুমোদনকে রাসূলুল্লাহ (স.) -এর বলে প্রচার করা হয়েছে তাকে হাদীস বলে। সাহাবী ও তাবিয়ীদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেও হাদীস বলে।

উল্লেখ্য মহানবী (স.) সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী আরব। অসংখ্য হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন কিন্তু একটি হাদীসও এরকম নেই যে, হাদীসের ভাষা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। রাসুল (স.) কে মহান আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে, তিনি সর্বকালে সকল সৃষ্টির চেয়ে সকল দিক থেকে সেরা হন। এ ক্ষেত্রে ভাষাগত দিকটিও প্রাধান্য পায়। নিঃসন্দেহে মহানবী (স.) এর ভাষা ছিল আরবী অলঙ্কারমন্ডিত। এতে করে সাহাবীদের উপর এর বেশ প্রভাব পড়ে। এ জন্য সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এমন এক জামা'আত আমরা লক্ষ করি যে, যারা কাব্য রচনা করেছেন এবং বক্তৃতার ময়দানে ফাসীহ এবং বালীগ বক্তব্যও প্রদান করেছেন।

---

২০২ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী যুগে আরবী অলঙ্কারপূর্ণ কাব্য সাধনা

ইসলামী যুগে মুসলিম কবিগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস চর্চায় বেশি মনোনিবেশ করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই ভালো কবিতা লিখতেন। মহানবী (সা,) এর নির্দেশে তাঁরা কবিতা রচনা করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে অন্যম ছিলেন কবি হাসসান ইব্ন সাবিত, ক্বাব ইব্ন মালিক, আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) প্রমূখ।

খোলাফায়ে রাশেদার কারো কারো কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল। হযরত ওসমান (রা.) তৃতীয় খলীফা। দানশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইসলামের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছেন। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দুনিয়া ত্যাগী মানুষের মতোই জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর সহায়-সম্পদ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কাজে তিনি ব্যয় করেছেন। মুক্ত হস্তে তিনি দান-সাদাকা করেছেন। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয় যুহদিয়াত কবিতার অন্তর্গত :[২০৩]

عني النفس يغني النفس حتس يكفها + و ان عضها حتي يضربها الفقر

وما عسرة فاصبر لها ان لقيتها + بكائنة الا سيتبعها يسر

"আত্মার ধনাঢ্যতা আত্মাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়, এমনকি সে যদি দরিদ্রও হয়ে যায় তবুও তার এই আত্মার ধনাঢ্যতা তাকে সর্ব প্রকারের ক্ষতি থেকে ফিরিয়ে রাখে; দুঃখ-কষ্ট কিছুই না; যদি তা তোমার উপর আপতিত হয় তাহলে ধৈর্য ধারন কর। কেননা, এই দুঃখ-কষ্টের পর পরই সুখ ও শান্তি রয়েছে।"

---

২০৩. ড. আবদুল জলীল, *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২০

হযরত আলী (রা.) ছিলেন চতুর্থ খলীফা। প্রথম তিন খলীফার শাসনামলে তিনি মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা কোন সমস্যায় পড়লে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এক প্রত্যুজ্জল মশাল হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে তিনি অপরিসীম অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সকল কবিতা আবৃত্তি করেছেন তা দিওয়ান আকারে সংরক্ষিত আছে। আর বহু কবিতা সংরক্ষণের অভাবে চিরতরে হারিয়ে গেছে। হযরত আলী (রা.) বিভিন্ন ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে বীরত্ব, যুদ্ধ ও জ্ঞান গর্ভ বিষয়েই তার কবিতা বেশি। তাঁর রচিত কবিতা নিঃসন্দেহে আরবী অলঙ্কারমন্ডিত। তাঁর কবিতার নমুনা:[২০৪]

انما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت + انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت

ولقد يكفيك ايها الطالب قوت + ولعمري عن قليل كل من فيها يموت

"নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর, এর কোন স্থায়ীত্ব নেই, এই দুনিয়ার উপমা হলো মাকড়সার তৈরি করা ঘর;

ওহে দুনিয়ার অন্বেষণকারী ! দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট, আর আমার জীবনের শপথ! খুব শিগগীর এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে, সবাই মারা যাবে।"

লাবীদ ইবন রাবীয়া (রা.) মুখাদরাম কবি। অমুসলিম ও মুসলিম উভয় অবস্থাতেই তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা আরবী অলঙ্কারমন্ডিত। তাঁর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। তাঁর অলঙ্কারপূর্ণ দুটি পঙক্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো:[২০৫]

الا كل شيئ ما خلا الله باطل + وكل تعيم لا سمالة زائل

---

২০৪. আলী (রা.), *দিওয়ান-ই-আলী (রা.)* (ঢাকা : র‍্যামন পালিশার্স, ২০০২ খ্রি:), পৃ. ১১৪
২০৫.ড. শাওকী দায়ফ, *খ.* ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

وكل انلس سوف تدخل بينهم + دويهية يصفر منها الانال

"ওহে জেনে রাখো! এক আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর –মিথ্যা, আর নিশ্চয় সকল সুখ-সম্পদ অস্থায়ী ও বিলীয়মান;

সকল মানুষ–অতি শ্রীঘ্র তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটবে, আর তাতে আঙ্গুলের আগা সমূহ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।"

কবি সাহম ইব্ন হানজালা ছিলেন মুখাদরাম কবি। তিনি ছিলেন শামের অধিবাসী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে প্রচুর কবিতা তিনি রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার নমুনা নিম্নরূপ:[২০৬]

ويحملنك اقنار علي زهد + ولا تزل في عطاء الله مرتغبا

الله يخلف ما انفقت محبسبا + اذا شكرت و يؤتيك الذي كتبا

"দুনিয়া ত্যাগের উপর কৃপণতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে, সর্বদাই তুমি আল্লাহর দাস সম্পর্কে খুশী ও আগ্রহী থাক;

তুমি যা খরচ কর আল্লাহ তা হিসাব করে তোমাকে দিয়ে দেবেন, যখন তুমি শোকর করবে আর তোমাকে তিনি তাই দিবেন যা যা তিনি লিখে রেখেছেন।"

কবি মিসকীন আদ দারেমী ৭০৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে তার রচিত কিছু পঙক্তি পেশ করা হলো :[২০৭]

وسميت مسكينا و كانت لجاجة + و اني لمسكين الي الله راغب

---

২০৬. ড. আবদুল জলীল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

২০৭.ড. শাওকী দায়ফ, খ. ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

ما انزل الله من امر فاكرهه + الا سيجعل لي من بعده فرجا

“আমি মিসকীন নামে পরিচিত হয়েছি, আর এটা ছিল দ্বন্দের ব্যাপার; আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট মিসকীন, তাঁরই প্রতি আসক্ত,

আল্লাহ এমন কোন বিষয় অবতীর্ণ করেননি যা আমি অপছন্দ করি; এটা ব্যতীত যে, আমার জন্য এরপর প্রাচুর্য আসবে।”

আবুল আসওয়াদ আল দুয়াইলী (রহ.) বানু কিনানা গোত্রের দুওয়াইল শাখায় হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি বসরায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি আলী (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর কবিতার নমুনা নিম্নরূপ :[২০৮]

واذا طلبت من الحوائج حاجة + فادع الاله واحسن الاعمالا

ان العباد وشانهم وامرهم + بيد الاله يقلب الاحوالا

”তুমি যখন তোমার কোন প্রয়োজন চাইবে তখন আল্লাহকে ডাকবে এবং ভালো কাজ করবে;

বান্দা ও তাদের অবস্থার বিষয়াবলী আল্লাহর হাতেই; তিনি অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেন।”

২০৮.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

উমাইয়া যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ

চতুর্থ অধ্যায়

উমাইয়া যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ
উমাইয়া যুগঃ পরিচিতি ও পরিধি

হিজরী ৪০ সনে মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ানের (রা.) খলীফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণের দিন থেকে হিজরী ৩২ সনের ২৭ জিলহাজ্জ অর্থাৎ সর্বশেষ উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদের নিহত হওয়ার দিন পর্যন্ত সময়কে উমাইয়া যুগ বলা হয়। সৌর হিসেবে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া যুগ।[২০৯]

এ যুগে মোট তেরো জন শাসক খিলাফত পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে বনু উমাইয়ার সুফিয়ানী শাখার ৩ জন এবং মারওয়ানী শাখার ১০ জন শাসক শাসনকার্য পরিচালনা করে গেছেন।

উমাইয়ারা যখন শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা সুদৃঢ় ছিল না। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫) আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করে। তাঁর শাসনামলে ৬৯৭ খ্রি. ইরাকে, ৭০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায়, ও ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে মিসরে আরবীতে সরকারী কাজ কর্ম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর শাসনামলে আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে আরবী মুদ্রার প্রচলন করা। তিনি ৬৯৬ খ্রিসটাব্দে পবিত্র কুরআনের আয়াত অঙ্কিত আরবী মুদ্রা চালু করেন।[২১০]

উমাইয়ারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তার করেছিলেন। খলীফা হিশামের (৭২৪-৭৪৩) শামনকালে সমগ্র স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, সিসিলী দ্বীপের বিছু অংশ, ভূমধ্য

---

২০৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭
২১০. আতম. ১৮২

সাগরের সকল দ্বীপ, সমগ্র উত্তর আফ্রিকা লোহিত সাগরের উপকূল হতে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশ– এ বিস্তৃত আঞ্চল জুড়ে ছিলো উমাইয়া খিলাফত।[২১১]

এ আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে হাদীস সংগ্রহের বিশাল কর্ম সম্পাদন হয়েছে এ যুগেই। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ইতিহাস, ভূগোল ও ভাষা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এ যুগে।

২১১. আতম., পৃ. ১৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমাইয়া যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ

এ যুগে শৈল্পিক গদ্য ও পদ্যে বহু মনীষী সাধনা করেছেন। এদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে অবদান বিষয়ে আলেঅচনা করা হলো।

গায়লান আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭২৪ খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম আবু মারওয়ান গায়লান ইব্ন মুসলিম আদ-দিমাশকী আল-কিবতী। তাঁর পিতা ছিলেন ওসমান ইব্ন আফফান (রা.) এর আযাদকৃত ক্রীতদাস। তিনি মাবাদ আল-জুহানীর সমসাময়িক ছিলেন এবং ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে ইরাক অতঃপর দামেশকে বসবাস করেন। ইরাকে অবস্থানের সময় জনৈক খ্রিস্টানের শিষ্যত গ্রহণ করেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন গায়লান আদ-দিমাশকী। তাঁর আকীদা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।আল-খায়্যাতের মতে তিনি মুতাযিলা ছিলেন,কেননা তিনি মুতাযিলাদের পাঁচটি মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন।শাহরাস্তানী তাঁকে মুবজিয়্যা বলে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ তাকে কাদারিয়্যা বলেছেন । তিনি বিশ্বাস করতেন ," আদি , সহজাত জ্ঞান যা হতে জানা যায় যে, বিশ্বের একজন স্ব সৃষ্ট শিল্পী আছেন, ঈমান কেবল একপ্রকার দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্জিত জ্ঞান।"[২১২]

গায়লানের মতাদর্শ যাই থাকুক না কেন তিনি আরবী গদ্য বিশেষ করে শৈল্পীক গদ্যে প্রভূত অবদান রেখেছেন।তিনিআব্দুল হামীদ, আবদুল্লাহ ইব্ন মুকাফফা, সাহল ইব্ন হারুন এর সমপর্যায়ের ছিলেন। ইবনুন নাদীমের অনুমান মতে তিনি প্রায় ২০০০ পাতার গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন।খলীফা হিশাম ইব্ন আব্দুল মালিকের শাসনামলে আনুমানিক

---

২১২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৮৪

১০৫-২৫হি./৭২৪-৪৩ খ্রি. তাঁর ভ্রান্ত আকীদার কারণে হাত-পা কেটে শুলীবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।[২১৩]

আব্দুল হামীদ

প্রকৃত নাম আব্দুল হামীদ ইয়াহইয়াহ ইব্ন সা'দ।তিনি আমির ইব্ন লুয়াই এর মাওলা বা মিত্র ছিলেন । তিনি আল-আনবারের অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন অতঃপর খলীফা হিশাম ইব্ন আব্দুল মালিকেরপ্রধান সচিব মাওলা সালিম-এর অধীনে উমাইয়া সচিবালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন।[২১৪]সর্বশেষ উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদের সাথেও তিনি কাজ করেন এবং মারওয়ান খলীফা হওয়ার পর তাঁরপ্রধান সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মারওয়ান যখন আব্বাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হন তখন তিনি তাঁর সঙ্গত্যাগ করেননি। ফলে ২৬ যুলহিজ্জা ১৩২ হি./৫আগস্ট,৭৫০ খ্রি. বুসীরে মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদের সাথে নিহত হন।[২১৫]

আব্দুল হামীদের রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে ছয়টি রাসাইল, কিছু সরকারী চিঠিপত্র সেই সাথে কিছু ব্যক্তিগত পত্রাদি।তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ রচনাটি হচ্ছে খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদের পুত্র আবদুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে লেখা পত্র।পত্রটির ভাষাগত বিষয়ে ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, "ইহাতে তিনি ব্যক্তিগত চরিত্র, রাজদরবারের অনুষ্ঠানাদি ও যুদ্ধ সম্পর্কে আবদুল্লাহকে প্রদান করিয়াছেন। ইহা আরবী কাব্য ও বাগ্মিতার উপমা, ছন্দ ও বাগধারার ভিত্তিতেরচিত। কিন্তু বহু স্থানে বিশেষ বিশেষ বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।"[২১৬]

২১৩.সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ, ১. পৃ. ৭৫৪
২১৪. প্রাগুক্ত
২১৫. প্রাগুক্ত
২১৬. প্রাগুক্ত

পত্রটির উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় এটি উমাইয়া সচিবালয়ে গ্রীক প্রভাবের কারণেই হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলী হচ্ছে, কুত্তাব বা সচিবদের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রাদি। এ সকল পত্রাদিতে কুত্তাব বা সচিবদের উদ্দেশ্যে রচিত। এ সকল পত্রাদিতে তিনি বিভিন্নসাচিবিক পদ ও দায়িত্বের মর্যাদা তুলে ধরেছেন। এ সকল পত্রের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাবলীল ও অকপট। গবেষকগণ মনে করেন আবদুল হামীদ পত্র রচনার কৌশল তথা এর বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার পদ্ধতি এবং অবয়ব সবগুলিই আরব ঐতিহ্য রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় এবং ইরানী সাসানী রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ।

এ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়:

"ইহার বিষয় বস্তুর তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় ইহা সাসানী সচিবালয়ের ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ইহার বহু স্থলে ইরানী দাবীরদের নীতিমালা ইসলামী ছাপসহ পরিবেশিত। তাহার অন্য একটি রচনা ইরানী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার নীতির বিবেচনায়ও আরবী ঐতিহ্য হইতেও পৃথক। রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্যে করিয়া প্রদত্ত প্রথম রিসালায় উদ্ধৃত নীতিমালা সমূহের বৃহদংশ সাসানী দরবারের আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যবহার বিধি হইতে গৃহীত। তবে সামরিক উপদেশাবলী গ্রীক রণকৌশল দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রভাব সাহিত্য কর্মসূত্রে বা বায়যান্টীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসিয়াছে।"[২১৭]

গবেষকদের ধারনা, তিনি ফার্সী ভাষা হতে সরকারি পত্রাবলী রচনা করে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরবী কৃষ্টি অনুযায়ী উপস্থাপন করেন। আব্দুল হামীদের অনন্য কীর্তি হচ্ছে, তিনি শৈল্পিক আরবী গদ্য রচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে ইব্ন আবদে

---

২১৭. প্রাগুক্ত

রব্বিহী বলেন,"তিনি প্রথম বাক্যালংকারের কুঁড়ি উন্মোচন করিয়াছেন, ইহা প্রস্ফুটনের পথ সুগম করিয়াছেন এবং কাব্যকে করিয়াছেন শৃংখলমুক্ত।"[২১৮]

আল-ফারাযদাক (মৃ. ১১০/৭২৮ খ্রি.)

প্রকৃত নাম আবু ফিরাস হাম্মাম ইব্ন গালিব ইব্ন সাসাআ আল-ফারাযদাক।আল-ফারাযদাক তাঁর ডাকনাম। এর অর্থ পোড়া রুটির টুকরো। কুৎসিত মুখায়ব ও কঠিন চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি তাই তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়।[২১৯]বানু তামীম গোত্রের বানু দারিম শাখায় কবি ২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[২২০]পিতা গালিব ছিলেন সমকালীন আরবের অন্যতম সেরা দানশীল ব্যক্তি। কবির দাদা সাসাআ জাহিলী আরবের খ্যাতিমান মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমন ত্রিশজন কন্যা শিশুকে ক্রয় করে মুক্তি দিয়েছিলেন যাদেরকে জীবন্ত সমাধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এজন্য তাকে মুহিউল মাওউদা তথা জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যার জীবন সঞ্চারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২২১]

শৈশব থেকেই তিনি কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পিতা তাকে আলী (রা.) এর নিকট নিয়ে যান। তিনি সেখানে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আল-ফারাযদাক একদিন মুদার গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি হবে-আলী (রা.) যেন তাঁর জন্য দু'আ করেন। আলী (রা.) তাঁর পিতাকে বলেন,"আপনি তাকে কুরআন শিক্ষা দিন। সেটিই তার জন্য মঙ্গল জনক হবে।"[২২২]

---

২১৮. প্রাগুক্ত
২১৯. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৪৯১
২২০. প্রাগুক্ত
২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১
২২২. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত.পৃ. ২১৭

আলী (রা.) এর উপদেশ আল-ফারাযদাকের উপর বেশ প্রভাব পড়ে। ফলে তিনি বহু সাধনা করে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন।পরবর্তীতে তিনি কাব্য জগতে প্রতষ্ঠা লাভ করেন। তিনি উমাইয়া যুগের সেরা তিন কবির অন্যতম ছিলেন। অহঙ্কার ও গৌরব গাথাঁয় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অন্যান্য শাখায়ও তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা আরবীঅলঙ্কারমন্ডিত ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "তাঁর কবিতাঅলঙ্কারমন্ডিত ও জাঁকজমকপূর্ণ; তবে তা জটিল ও কঠিন শব্দে ভরপুর। বাক্য বিন্যাসে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করায় তাঁর বহু কবিতার অর্থ হৃদয়ঙ্গমে দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। জাহিলী ধারার বেদুঈনী ছাঁচে গড়া তাঁর কবিতায় নগর সভ্যতার প্রভাব নেই বললেই চলে।উন্নত শৈলী, অলঙ্কারপূর্ণ শব্দ ও শক্তিশালী গঠনে ফারাযদাকের কবিতা যেন মজবুত ইমারত।"[২২৩]

فخريةকবিতার জন্য প্রয়োজন উত্তম শব্দ ও গম্ভীর বাচনভঙ্গি।আল-ফারাযদাকের কবিতায় এর সমাবেশ লক্ষ্যণীয়।[২২৪] আল-ফারাযদাক অন্যের প্রশংসায় কাব্য রচনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে তার একটি আদর্শ ছিল। আত্মমর্যাদা ক্ষুন্নহয় এমন সব কথা তিনি বলতেন না। একবার তিনি ইয়াযিদ ইব্ন মুহাল্লাবের প্রশংসা করেছিলেন। এরপরখলীফা ইয়াযিদ ইব্ন আব্দুল মালিক তার নিন্দা করার কথা তাঁকে বললে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন,"এক কালে তাদের প্রশংসা করেছি। এখন তাদের বদনাম করে আমি নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে পারবো না।"[২২৫]আল-ফারাযদাক নবী পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খলীফা হিশাম ইব্ন আব্দুল মালিক একবার হজ্জে গিয়ে আলী ইব্ন হুসাইন (রহ.) এর সম্মান ও মর্যাদা দেখে তাঁকে না চেনার ভান করে প্রশ্ন করলে তিনি কবিতার মাধ্যমে সমুচিত জবাব দেন। যেমন-তিনি বলেন:

২২৩.ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮
২২৪. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত.পৃ.২২০
২২৫. প্রাগুক্ত.পৃ. ২২০

هذا الذى تعرف البطحاء وطاقة + والبيت يعرفه والحل والحرم

"ইনি সেই ব্যক্তি যার কদম মোবারক মক্কা ভূমি চিনে এবং তিনি আল্লাহর ঘর ও হেরম শরীফ এ হারামের বাইরের স্থান সমূহের নিকটসুপরিচিত।"[২২৬]

আল-ফারাযদাক ১১০ হিজরী/৭২৮ খ্রি.মৃত্যুবরণ করেন। তার কাব্য নিঃসন্দেহে আরবী অলঙ্কারমন্ডিত। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানীর মতে তিনি ছিলেন ইসলামী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ।[২২৭] তাঁর কবির নমুনা:

كنا اذا الجبار صعر خده + ضربناه حتى تستقيم الأخادع

ترى كل مظلوم الينا قراره + ويهرب منا جهده كل ظالم

"যখন কোন অহঙ্কারী ব্যক্তি তার মুখ ঘৃণা ভরে ফিরিয়ে নেয় তখন আমরা তাকে এমন আঘাত হানি যে তার মুখ সোজা হয়ে যায়।

তুমি দেখবে অত্যাচারিত ব্যক্তি আমাদেরনিকট আশ্রয় নেয় এবং যালিম আমাদের থেকে পালিয়ে যেতে সদা সচেষ্ট।"[২২৮]

জরীর (মৃ.১১০হি.)

তাঁর প্রকৃত নাম আবু হাযরাহ জারীর ইব্ন আতিয়্যা।তামীম গোত্রের কুলায়ব শাখায় তাঁর জন্ম। ওসমান ইব্ন আফফান(রা.) অথবা মুআবিয়া (রা.) এর শাসনামলে ইয়ামামায়

---

২২৬. প্রাগুক্ত.পৃ. ২১৯
২২৭. প্রাগুক্ত. পৃ. ২২২
২২৮. প্রাগুক্ত

এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে পিতার সঙ্গে মেষ-বকরি চরিয়ে।[২২৯]

মরু অঞ্চলে তাঁর শৈশব কাটানোর কারণে তাঁর ভাষা ছিল বিশুদ্ধ, মিশ্রণ দোষে তা দুষ্ট হয়নি। শৈশবেই তিনি কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি গাসসান আস-সালিতীর কাব্য প্রতিভা অবলোকন করে কবিতা রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। আস-সালিতী যখন কবিতা আবৃত্তি করতেন তখন লোকেরা তাঁর আবৃত্তি শুনার জন্য ভীড় জমিয়ে ফেলতো । এক পর্যায়ে জারীর আস-সালিতীর সাথে কবিতার লড়াইয়ে অবতীর্ন হন।[২৩০]

জারীর কবিতার ময়দানে আগমন করার পর অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বসরায়তখন অবস্থান করছিলেন কবি আল-ফারাযদাক। তাঁর কবি প্রতিভার সুখ্যাতি তখন চতুর্দিকে। জারীর চলে যান বসরায় এবং সেখানকার সুধীমহলে পরিচিত হন।[২৩১]

তৎকালীন গভর্নর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের প্রসংসায় তিনি কবিতা রচনা করলে হাজ্জাজ খুশী হয়ে তাকে উপযুক্তসম্মানী প্রদান করেন। কবিতাটি জনগণের প্রশংসা লাভ করে। খলীফা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান জানতে পেরেজারীরের প্রতি আগ্রহী হন। হাজ্জাজ তাঁকে দামেশকে খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন এবং তিনি সেখানে খলীফা প্রশংসায় কবিতা রচনা করে তাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হন এবং বহু উপঢৌকন লাভ করেন।[২৩২]

---

২২৯. প্রাগুক্ত.পৃ. ২২২
২৩০. প্রাগুক্ত
২৩১. প্রাগুক্ত
২৩২. প্রাগুক্ত.পৃ. ২২৩

সমকালীন আশিজন কবি তাঁর বিপক্ষে ছিলেন। আল-ফারাযদাক ও আখতল ছাড়া বাকী সবাইকে তিনি কবি লড়াইয়ে পরাজিত করেছিলেন। অর্ধ শতাব্দীকাল আল-ফারযদাকের সাথে তাঁর লড়াই চলে।[২৩৩]

ব্যক্তি জীবনে জারীর খুব অগোছালো লোক ছিলেন। নিজের এবং তদীয় পিতার কৃপণতা তিনি স্বীকার করতেন। তবে পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।[২৩৪]জারীর সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন প্রণয় কবিতায়। এ সম্পর্কে আতম মুসলেহ উদ্দীন বলেন, "জারীর সব চাইতে অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন প্রণয়মূলক কবিতায়। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।ফরযদাকের ন্যায় প্রেমিক হওয়ার ভান করেননি অথবা আখতলের মত খেয়ে মাতালও হননি। তবুও প্রেম সম্পর্কে তাঁর রচিত কবিতা ফরাযদাকেরও ঈর্ষার বস্তু ছিল।"[২৩৫]

জরীর এ সম্পর্কে বলেন, "আমি কখনও কারও সাথে প্রেম করিনি, যদি করতাম তাহলে এমন প্রেমের কবিতা রচনা করতাম , যা শুনে বৃদ্ধা তার যৌবনের জন্য কাঁদতো।"[২৩৬]

তাঁর কবিতার নমনা:

سرى نحوهم ليل كان نجومه + فناديل فيهم الذبال المفتل

"তাদের দিকে রাত এগিয়ে আসছে,রাতে তার কাগজগুলো প্রদীপ সমূহের মত, যেসব প্রদীপে পাকানো ফিতা রয়েছে।"[২৩৭]

২৩৩.প্রাগুক্ত.পৃ.২২৩
২৩৪. প্রাগুক্ত.পৃ. ২২৩
২৩৫. প্রাগুক্ত
২৩৬. প্রাগুক্ত
২৩৭. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত.পৃ. ২২৬

তাঁর কবি ভাষা সম্পর্কে আল-ফারাযদাক বলেন: "ইবনুল মারাগাহ (জরীরকে ব্যঙ্গ করে এ নামে ডাকা হতো; অর্থকুৎসিত গর্দভীর সন্তান) কবিতায় কোমলতার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু ভালো হতো যদি সে আমার কাঠিন্য কিছু পেতো। আর আমিও সব কিছু সত্ত্বেও তার কবিতার সুকুমারতা প্রাপ্ত হইনি।"[২৩৮]

এ সম্পর্কে আতম মুসলেহ উদ্দীন বলেন, "জরীরের ভাষা সহজ ,তিনি কঠিন ও বিরল শব্দ খুব কম ব্যবহার করেছেন। এ জন্য সাধারণ লোকদের নিকট তাঁর কদর ছিল। সহজ বোধ্য বলে তাঁর কবিতা সকলেই পড়তো এবং অল্প সময়ে লোক মুখে প্রচারিত হয়েযেতো।"[২৩৯]

আল-আখতল (মৃ. ৯৫হি/৭১৩ খ্রি.)

প্রকৃত নাম আবু মালিক গিয়াস ইব্ন গাওস ইব্ন আস-সালাত। তিনি আনুমানিক ১৯হি./৬৪০খ্রি. বনু তাগলিব গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি খ্রিস্ট্রান ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং সর্বক্ষণ বুকে ক্রশচিহ্ন ধারন করতেন। এ জন্য তাকে যুস-সালীব' বা ক্রশধারী নামে ডাকা হতো।[২৪০]

শৈশবের তিনি কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ব্যঙ্গ কবিতা দিয়েই তাঁর কাব্য সাধনার সুত্রপাত ঘটে।সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি কা'ব ইব্ন জুহাইলের নিন্দা করেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন এমন কি কবিতার লড়াইয়ে তিনি কা'বকে পরাজিত করেন। তিনি তাঁর পিতার নিন্দা করেও কবিতা রচনা করেছেন। আর

---

২৩৮. প্রাগুক্ত.পৃ. ২২৫
২৩৯. প্রাগুক্ত
২৪০. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬

এ জন্য তাকে আল-আখতল বা বোকা নামে অভিহিত করা হয়।[২৪১]

আখতল ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়ার সুনজরে পড়েন। ইয়াযিদ তাঁকে দিয়ে আনসারদের বিরুদ্ধে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন এবং সফলকাম হন। ফলে আখতল আনসারদের নিন্দা করে কাব্য রচনা করে। মুআবিয়া (রা.) বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর জিহবা উৎপাটনের নির্দেশ দেন। কিন্তু ইয়াযিদের মধ্যস্থতায় আখতল ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হন।[২৪২]

আল-আখতল পরবর্তীতে উমাইয়াদের দরবারী কবিতে পরিণত হন। উমাইয়া রাজন্যবর্গ তাঁকে দিয়ে ফরমায়েশী কবিতা রচনা করিয়েছেন। আল-আখতল যেহেতু খ্রিস্টান ছিল ফলে আনসার , নবী-পরিবার, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যাদের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে- তাদের নিন্দা করতে দ্বিধা করতেন না। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আল-আখতলকে পছন্দ করতেন। তিনি তার কাব্যের সমঝদার ও ভক্ত ছিলেন। আবদুল মালিক আখতলকে দিয়ে উমাইয়া শাসনের পক্ষে কাব্য রচনা করিয়েছেন। আবদুল মালিক তাঁকেউমাইয়াদের কবি, আমীরুল মুমিনীনের কবি, আরবদের কবি অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন।[২৪৩]

খলীফা ওমর ইব্ন আবদুল আযীয (রহ.) তাঁকে প্রদত্ত সকল পদমর্যাদা প্রত্যাহার করে নেন। ৭০ বছর বয়সে ৯৫ হিজরী সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আল-আখতলের দীওয়ান বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৪৪]

---

২৪১. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত.পৃ. ২১৪
২৪২. প্রাগুক্ত
২৪৩. প্রাগুক্ত.পৃ. ২১৫
২৪৪. প্রাগুক্ত.পৃ. ২১৭

আখতল প্রশংসা বর্ণনায়,শরাবের বর্ণনা প্রদানে, শালীনতা রক্ষা করে ব্যঙ্গ করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কবিতা রচনায় খুব সতর্ক থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ৯০ লাইনের একটি কবিতাকে পরিমার্জন করে ৩০লাইনে নিয়ে আসতেন।

এ সম্পর্কে আহমদ হাসান আয-যায়্যাত বলেন," কাব্যের পরিমার্জনে স্বভাবগত দৃষ্টি, ত্রুটিমুক্ত কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতার নোংরামী পরিহার, প্রশংসামূলক কবিতা ও শরাবের বর্ণনায় নৈপুন্য প্রদর্শন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে কবি আল-আখতল বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ।"[২৪৫]

কবি জারীর বলেছেন,"আমি যখন তাকে (আল-আখতলকে) পেলাম তখন সে এক দন্ত বিশিষ্ট (বার্ধক্যে উপনীত)। যদি আমি তাকে দুই দন্তসমেত(যৌবনে)পেতাম তাহলে সে আমাকে গ্রাস করে ফেলতো।"[২৪৬]

ভাষাবিদ আবু আমর ইব্ন আলা আল-আখতল সম্পর্কে বলেছেন,"আল-আখতল জাহিলী যুগের একটি দিনও যদিপেতেন, তবে আমি অন্য কাউকেই তাঁর উপর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতাম না।" [২৪৭]

কবি আল-আখতল এর কবিতার নমুনা:

بنى أمية ، نعماكم مجللة + تمت فلا منة فيها ولا كدر

بنى أمية، انى ناصح لكم + فلا يبيتن فيكم امنا زفر

"ও হে বনু উমাইয়া! তোমাদের অনুগ্রহরাজি সর্বব্যাপী পূর্ণতা লাভ করেছে। যাতে কোনোরূপ খোঁটাদান ও কদর্যতা নেই।

---

২৪৫. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, পৃ. ১১৯

২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

২৪৭. দীওয়ানু আখতল, পৃ. ১৬ .;ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, পৃ. ৫৩০

ও হে বনু উমাইয়া! আমি তো আপনাদের মঙ্গলকামী; সুতরাং আমি চাই না আপনাদের মাঝে (শত্রুগোষ্ঠি) যুফার (কায়স আয়লান-গোত্রীয় নেতা) নিরাপদে রাত যাপন করুক।"[২৪৮]

ওমর ইব্ন আবী রাবীয়াহ (২৩-৮৩ হি.)

কবির প্রকৃত নাম আবুল খাত্তাব ওমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রাবীয়াহ হুযায়ফা। তিনি কুরাইশ গোত্রের বানু মাখযুম শাখায় ২৩ হি./৬৪৪খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। কবির দাদা আবু রাবীয়াহ হুযায়ফা একজন খ্যাতিমান বীর পুরুষ ছিলেন। বর্শা চালনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে দু'টি বর্শা নিয়ে তিনি লড়াই করতেন। এ জন্য যুর-রুমহায়ন (দুই বর্শাধারী) নামে তাঁকে অভিহিত করা হতো।[২৪৯] কবির দাদা বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন বলে পিতার পরিবর্তে তিনি দাদার নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।[২৫০] কবি যেদিন জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সেদিন ইন্তিকাল করেন। এজন্য তাঁর সম্পর্কে পরবর্তীতে বলা হয়ে থাকে "এ কোন তিরোধান ঘটল আর কোন স্রষ্টা প্রতিস্থাপিত হলো।"[২৫১]

তার বাবা ইসলামের প্রথম তিন খলীফার শাসনামলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন।[২৫২] তবে বাবার স্নেহ তিনি বেশি দিন পাননি,শৈশবেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর মায়ের তত্ত্বধানেই লালিত-পালিত হন।প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান হওয়ায় ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপকরণ তাঁর সামনে ছিল, ফলে তিনি গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেন। তিনি হয়ে ওঠেন বখাটে ও উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া ও দুরন্ত স্বভাবের। তিনি নারীর প্রতি প্রচন্ড দুর্বল ছিলেন। কোনো রূপসী নারী তার নজরে পড়তেই তিনি তাকে প্রেম

২৪৮.ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭
২৪৯. ইব্ন দুরাইদ,প্রাগুক্ত, পৃ, ১০১
২৫০. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০
২৫১.যাইয়াত, পৃ. ১১৫
২৫২. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত.পৃ. ২১১

নিবেদন করতে এতটুকু দেরী করতেন না। পবিত্র হজ্জ পালনার্থে মক্কায় অবস্থানকারী নারীরাও তাঁর কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতেন না। তিনি তাদের পিছু নিতেন এবং প্রেম নিবেদন করে কবিতা রচনা করতেন।[২৫৩]এমনকি তিনি হুসাইন ইব্ন আলী (রা.) এর কন্যা সুকায়নাকে নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন:

"হে সুকায়না, আমার মত তৃষ্ণার্ত, মদ্য পানে আসক্ত ব্যক্তির জন্য ফুরাতের সুরভিত মিষ্টি পানি তোমার চাইতে সুস্বাদুনয় ; তুমি দূরে চলে যাও (আমাকে ভুলে যাবে), কারণ মেয়েরা চোখের আড়ালে গেলে ভালবাসার আমানতের হিফাজত করেনা।"[২৫৪]

জীবনের শেষ বয়সে এসে কবি খুব অনুতপ্ত হন এবং সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করে শুদ্ধ জীবন যাপনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ওমর ইব্ন আব্দুল আজিজ (রহ.) তাঁকে লোহিত সাগরে অবস্থিত দাহলাক দ্বীপে নির্বাসন দেন। সেখান থেকে তিনি এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে নৌজাহাজে ওঠেন এবং জাহাজে আগুন লেগে যায় আর তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, " ওমর ইব্ন আবীরাবীয়াহ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হয়েছেন।"[২৫৫]

কুরাইশদের মধ্য থেকে মানসম্পন্ন কবির সংখ্যা খুব কম ছিল। তিনি কাব্য জগতে অসাধারণ নৈপুন্য প্রদর্শন করায় তাঁকে শাইরুল কুরাইশ বলা হতো। তাঁর সম্পর্কে কবি জারীর বলেছেন," এ কুরাইশী যুবক কিন্তু ছন্দ যুক্ত বাক্য রচনা করেছিল, আর এখন দেখছি সে সত্যই কবিত্ব করছে। কবি ফারাযদাক তাঁর গযল কবিতা শুনে বলেছিলেন, " কবিরা প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের কবিতা বলতেই আগ্রহী ছিল-কিন্তু তা পারেনি বলে প্রিয়ার বাস্তভিটার স্মরণে কেঁদেছে আর সেই আকাঙ্খিত বস্তু সে (ওমর) লাভ করেছে।" [২৫৬]

---

২৫৩. ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪১
২৫৪. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত.পৃ. ২১১
২৫৫. ইবন কুতাইবা, ৫৫৪
২৫৬. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত.পৃ. ২১২

তার কাব্য প্রতিভা মূল্যায়নে আতম মুছলেহ উদ্দীন বলেন :

“উমারের কবিতার ভাষা সহজ , শব্দ সুন্দর, বর্ণনা চমৎকার, বাচন ভঙ্গি পরিপক্ব এবং বিষয়বস্তু সহজবোধ্য। কবিতাগুলো প্রেমের কাহিনী বলে ভ্রম হয়। তাঁর প্রেম ছিল ভাসা ভাসা, ফলে তাঁর কবিতায় গভীরতা নেই। পাঠক তা পড়ে আনন্দ লাভ করে, কিন্তু অভিভুত হয় না। জমীলের কবিতায় ছিল গভীরতা এবং খাঁটি ভলবাসার সুন্দর নিদর্শন।”[২৫৭]

তার কবিতার নমনা :

ألا يا بكر قد طرقا + خيال هاج لى الأرقا

بزينب إنها همى + فكيف بحبلها خلقا

خدلجة إذا انصرفت + رأيت وشاحها قلقا

“ওহে বকর !যায়নাবের কল্পনা আমার মানসপটে আগমন করেছে, ফলে আনিদ্রা আমাকে অস্থির করে তুলেছে।

সেই (যায়নবই) আমার কল্পনা, তবে কীরূপে তার (এই অসাধারণ) দেহাবয়ব সৃষ্টি হল। হৃষ্ট পুষ্ট সে রমনী যখনপেছন ফিরে তখন তুমি তার কোমরবদ্ধ অসামঞ্জস্য (সুক্ষ্ম কোমর) দেখতে পাবে। আর নূপুর ভর্তি তার পায়ের গোছা তোমার কাছে শাসরুদ্ধ (হৃষ্টপুষ্ট) মনে হবে।”[২৫৮]

---

২৫৭. প্রাগুক্ত

ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসীয় যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসীয় যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগঃ পরিচিতি ও পরিধি

১৩২ হি./৭৫০ খ্রি. থেকে ৬৫৬হি./১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে আব্বাসী যুগ বলা হয়। আব্বাসীদের প্রথম শাসক হচ্ছেন আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ। তিনি ছিলেন রাসুল (স.) এর চাচা আব্বাস ইব্ন আব্দিল মুত্তালিব-এর বংশধ। এ কারণে এ বংশের লোকদের আব্বাসী বলা হয়। আববাসী শামকদের মধ্যে এমন কয়েকজন শাসক ছিলেন যাঁরা শুধু শক্তিশালী নৃপতিই ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পৃষ্টপোষক। এদের মধ্য থেকে খলীফা হারুনুর রশীদ (৭৬৫-৮০৮খ্রি.) ও তদীয় পুত্র মামুনুর রশীদের (৭৮৬-৮৩৩) নাম প্রণিধানযোগ্য। খলীফা হারুনুর রশীদ বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন আর এর মধ্য দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তিনি ঈসায়ী ও ইয়াহুদী পণ্ডিতদেরও সমাদর করতেন। বেশ কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত তাঁর দরবারে উপস্থিত হন তিনি তাদের যথেষ্ট সমাদর করেন। তাঁর শাসনামলে হিব্রু ভাষার বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়। তাঁর রাজধানী বাগদাদ ছিল স্বপ্ন নগরী। কাব্য, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, সংগীত প্রভৃতির চর্চার জন্য বাগদাদ নগরী ছিল আদর্শ শহর। খলীফা মামুন পিতার মতোই বিদ্যেৎসাহী ছিলেন। মামুন এরিস্টটলসহ অন্যান্য পণ্ডিতদের পুস্তকাদির অনুবাদকল্পে রোমান সম্রাটকে নির্দেশ দিলে তিনি পাঁচটি উট বোঝাই করে দর্শনের বই-পত্র পাঠিয়ে দেন। মামুন বিশিষ্ট পণ্ডিত ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক আল-কিন্দিকে গ্রন্থগুলোর অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেন।[২৫৯]

---

২৫৯. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, অনু. মাওলানা আব্দুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, ২য় সং. পৃ. ৩৮৯

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়নের কারণে মামুনের দরবারে দূর-দূরান্ত থেকে পণ্ডিত ব্যক্তি বর্গ ভীড় জমাতে থাকেন। তিনি তাঁদের উচ্চ বেতন নির্ধারণ করেন। বাইতুল হিকমার পণ্ডিতদের এক একজনের বেতন ছিল আড়াই হাজার মুদ্রা। তাঁর দরবার যারা আলোকিত করেছেন তাদের মধ্যে হুনাইন ইব্ন ইসহাক, কাস্তা ইব্ন লুক বা'লাবাক্কী, আবু জাফর ইয়াহিয়া ইব্ন আদী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসা আল-খাওয়ারেজমী, খালিদ ইব্ন আদুল মালিকের নাম প্রণিধানযোগ্য।[২৬০]

---

২৬০ . প্রাগুক্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ

আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রও প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এমনকি এ শাস্ত্রটি এ যুগেই পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে এ বিষয়ে খ্যাতিমান মনীষীদের অবদান ও এ শাস্ত্রের বিকাশ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

খলীল ইবন আহমদ আল-ফারাহেদী(মৃ. ১৮০ হি./৭৯৬ খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম আবূ আবদুর রহমান আল-খালীল ইব্ন আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন তামীম আল-ফারাহীদী আল-আযদী আল-বাসরী। তিনি খালীল ইব্ন আহমাদ আল-ফারাহীদী নামেই সমধিক পরিচিত।[২৬১]

আল-খালীল জাযিরাতুল আরবের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বর্তমান ওমানের এক অঞ্চলে ১০০ হি./৭১২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই বসরায় গমন করেন ও সেখানেই লালিত পালিত হন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর কর্মজীবনের সবটাই সেখানে অতিবাহিত করেন।[২৬২] তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবু আমর ইবনুল আলা (৭০-১৫৪ হি.) ও ঈসা ইব্ন আমর (মৃ. ১৪৯ হি.)। তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁরা পরবর্তীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন সীবাওয়ইহি (মৃ. ১৮৩ হি./৭৯৬ খ্রি.), আল-কাসাঈ (মৃ. ১৮৯

---

২৬১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫), ৪র্থ সং, পৃ. ৯
২৬২. প্রাগুক্ত, ৯-১০

হি.), মু আরবিসজ আস-সাদুসী(মৃ. ১৯৫ হি.), আন-নাদর ইব্ন শুমাইল (মৃ. ২০৩ হি.) আল- আসমাঈ (১২৩-২১৭ হি.)প্রমূখ।[২৬৩]

আল-খালীল স্বীয় যুগের সেরা ব্যাকরণবিদ ছিলেন। বসরায় তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগেই থাকতো। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন সীবওয়াইহি ও আল-আসমাঈ। সীবাওয়াইহি স্বীয় উস্তাযের সান্নিধ্যকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ফলে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন।মীবাওয়াইহি ব্যাকরণ শাস্ত্রের অমর গ্রন্থ " কিতাব ফিন নাহ্উ"-এর জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি এ গ্রন্থে তাঁর শিক্ষকদের মতামতসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। ৮৫৮টি স্থানে তিনি এরকম উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এর মধ্যে আল-খালীলের উদ্ধৃতি হচ্ছে ৫২২টি স্থানে । এ থেকে অনুমান করা যায়। তাঁর উপর আল-খালীলের প্রভাব কীরূপ ছিল।[২৬৪]

আল-খালীল সারা জীবন জ্ঞানচর্চায় অতবাহিত করেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। এ সব শাস্ত্রের নতুন নতুন সূত্রও তিনি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি আরবি ছন্দ শাস্ত্রের জনক ছিলেন।আরবি কবিতার প্রচলিত ছন্দ ১৬টি এর মধ্যে আল-খালীল ১৫টিই উদ্ভাবন করেন। আরবী অভিধান শাস্ত্রেও তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। এ বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম "কিতাবুল আইন"। কিতাবুল আইনের আগেও কিছু অভিধান রচিত হয়। কিন্তু সেসব ক্ষুদ্র পুস্তিকাসমূহের মাধ্যম আরবী ভাষার শব্দাবলীর পুর্নাঙ্গ পরিচয় লাভ সম্ভব ছিল না। আর কিতাবুল আইনই হচ্ছে আরবী ভাষায় রচিত প্রথম পূর্নাঙ্গ অভিধান।[২৬৫]

---

২৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
২৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪
২৬৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

আল-খালীল মূলতঃ ছন্দবিজ্ঞানী ও ব্যাকরণবিদ হলেও তিনি বালাগাত তথা আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রেও যথেষ্ট প্রভূত অবদান রেখেছেন। ইবনুল মু'তায (মৃ. ২৯৬ হি./৯০৮ খ্রি.) كتاب البديعনামক গ্রন্থে ভূমিকায় বলেছেন যে, আল-খালীল علم البديعএর কতকগুলো পরিভাষার নামকরণ করেছেন।[২৬৬]এই মহান সাধক ১৭৫ হি./৭৮৬ খ্রি.বসরা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।[২৬৭]

ফাররা আল-নাহবী (মৃ. ২০৭ হি./৮২২ খ্রি.)

প্রকৃত নাম আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইব্ন যিয়াদ আল-আসলামী আদ-দায়লামী। আরবী ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণে তিনি স্বীয় যুগের সেরা পন্ডিত মনীষী ছিলেন। নাহু শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের কারণে তাঁকে ফাররা আল-নাহবী বলে অভিহিত করা হয়। আল-ফাররা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে ভাষাতত্ত্ববিদ, বৈয়াকরণ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন।তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে কিতাবু মাছাদির ফিল কুরআন, কিতাবুল ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা, কিতাবুল জামউ ওয়া তাছলিয়াতু ফিল কুরআন, আলাতুল খতিব ও কিতাবুল মুফাকির উল্লেখযোগ্য।

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর তার প্রণিত গ্রন্থ হচ্ছে معانى القرأنএ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের আয়াতের তারকীব ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ايجاز،تأخير، تقديم، استعارة، كناية، تشبيه اطناب،প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।[২৬৮]

২৬৬. ড. মু.নকিবুল্লাহ, পৃ. ১৪
২৬৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২৬৮. ড. মু.নকিবুল্লাহ, আরবী অলংকার বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

রশীদ আমর ইব্ন মুসান্না আত-তামিমী (মৃ. ২১০ হি./৮২৫ খ্রি.)

রশীদ আমর ইব্ন মুসান্না আল-খালীল ইব্ন আহমাদ আল-ফারাহীদীর ছাত্র ছিলেন। তিনি আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে অনন্য অবদান রাখেন। তিনি علم البيانএর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন।এর নাম হচ্ছে مجاز القران এটি এ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত।[২৬৯]

বাশার ইব্ন আল-মুতামির আল-মুতাযিলী (মৃ. ২১০ হি./৮২৫খ্রি.)

বাশার ইব্ন আল-মুতামির আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখেন। তিনি এ বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় যা পরবর্তী সময়ের আরবী অলঙ্কারবিদগণ বহু উপকার লাভ করেছেন। আল-জাহিয প্রণীত আল-বায়ান ওয়াত-তারয়ীন গ্রন্থে এ শাস্ত্রে তাঁর বহুবিদ অবদান পরিলক্ষিত হয়।[২৭০]

আবু উবায়দা (মৃ. ২১১ খ্রি.)

প্রকৃত নাম আবু উবায়দা মু'আম্মার ইবনুল মুসান্না।তিনি আনুমানিক ৭২৮ খ্রিস্টাব্দে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইয়াহুদী-ইরানী পিতামাতার দাস পুত্র। তিনি স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষী ছিলেন। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।[২৭১] আবুল ফায়াজ আল-ইসফাহানী ও ইবনুল 'আমীদের রচনাবলীতে তাঁর

---

২৬৯. প্রাগুক্ত

২৭০. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৭১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২২৫

জ্ঞান-গরিমার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, তাঁরা তাঁর রচনাবলী থেকে বহু উদ্বৃতি দিয়েছেন।[২৭২]

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম পুর্নাঙ্গ গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেন مجاز القران। এ কিতাবের নামকরণে مجاز শব্দ দ্বারা তিনি المعانى بيانকে বুঝিয়েছেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থে তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত التفات، حذف، ذكر، تأخير، تقديم، استعارة، كناية، تشبيه প্রভৃতি বিষয় আলোকপাত করেছেন। পরবর্তীতে অনেক মনীষী তাঁর অনুসরণে استعارة ও كنايةসম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[২৭৩]

আল-আসমায়ী (মৃ. ২১১হি./৮২৬ খ্রি.)

প্রকৃত নাম আবু সাঈদ আব্দুল মালিক ইব্ন কুরাইব। আল-আসমায়ী নিসবতটি তাঁর পূর্ব পুরুষ আল-বাহিলী গোত্রের আসমা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।[২৭৪] আল-আসমায়ী ভাষাতত্ত্ববিদ আবু উবায়দা ও আবু যায়দ আল-আনসারীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বসরার উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় আমর ইবনুল আলা ও খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহেদীর শিষ্য ছিলেন।[২৭৫]তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আবু নাসর আহমাদ ইব্ন হাতিম আল-বাহিলী ইব্ন হাবীব, আলী ইব্ন আব্দিল্লাহ আত-তুশী ও আল-জাহিয।[২৭৬]

---

২৭২. প্রাগুক্ত
২৭৩. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২৭৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪২০
২৭৫. প্রাগুক্ত
২৭৬. প্রাগুক্ত, ৪২১

আল-আসমায়ী বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ও অনন্য সাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বীয় উস্তায আবু আমরের পরামর্শে বেদুইনদের নিকট থেকে আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান অন্বেষণের জন্য অশ্বারোহনে বেড়িয়ে পড়েন। তিনি বেদুইনদের সন্ধানে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাদের কাছ থেকে খণ্ড কবিতাগুলো সংগ্রহ করতে চেষ্টা করতেন।বহু পরিশ্রমের ফলে তিনি জ্ঞান চর্চায় এমন এক স্থানে পৌঁছে যান যে, যৌবনেই তাঁর পাঠদান মজলিস সুপরিচিত হয়ে ওঠে এবং জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট জ্ঞান লাভের আশায় তাঁর মজলিসে ভিড় করতে থাকে।[২৭৭]

এক সময় তিনি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী বাগদাদ গমন করেন। সমকালীন খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সাথে জাফর ইব্ন ইয়াহইয়াহ বারমাকীর সাথেও তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। খলীফা হারুনের মৃত্যুর পর তিনি বসরায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মার্ভে মৃত্যুবরণ করেন।[২৭৮]

আল-আসমায়ী প্রভূত সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়বিমুখতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সাদাসিধে জীবন যাপনকেই তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।তিনি দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রা.) ও ইমাম আল-হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর জীবন ধারাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[২৭৯]

বসরার ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মাত্র চারজন মনীষী সুন্নাহর একনিষ্ট অনুসারী ছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন আল-আসমায়ী। প্রাক ইসলামী যুগের বিখ্যাত কবিদের কাসিদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদর শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি । সেই সাথে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। জাহিলী যুগের ৭২টি খন্ড কবিতা তিনি আল-আসমাঈয়্যাতে একত্রিত

---

২৭৭. প্রাগুক্ত, ৪২০
২৭৮. প্রাগুক্ত
২৭৯. প্রাগুক্ত

করেছেন। সাহিত্য সমালোচনা বিষয়েও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর পরবর্তী সময়ের পন্ডিতগণ এ বিষয়ে তাঁর বহু উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[২৮০]

আল-আসমায়ী আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি এ বিষয়ে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা না করলেও علم البلاغة বিষয়ে বহু তথ্য আবিষ্কার করেন।বিশেষত তিনি الالتفات। এর এমন কিছু আলোচনা করেছেন যা ইলমুল বালাগাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।[২৮১]

আল-জাহিয (মৃ. ২৫৫ হি./৮৬৯ খ্রি.)

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ হচ্ছেন আল-জাহিয। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-বায়াল ওয়াত-তাবয়ীন । এ ছাড়া إعجاز القران নামেও একটি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন।

তিনি البيان والتبيين গ্রন্থে গ্রীক,পারশ্য ও ভারতীয় অলঙ্কারবিদদের অলঙ্কার সম্পর্কীত বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনা করেছেন। সেই সাথে আরবী অলঙ্কারের নিয়মনীতির সাথে অন্যান্য ভাষার সমন্বয় করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি পূর্ববর্তী অলঙ্কারবিদদের বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করেছেন। সেই সাথে إستعارة ও كناية সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত এ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে تشبيه ، كناية ও استعارة সম্পর্কে ব্যাখামূলক আলোচনা করে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন। তিনি এ গ্রন্থে استعارة ও تشبيه সম্পর্কীত পার্থক্য তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। এগুলোর বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করে আলোচনা সারগর্ভ করে

---

২৮০. প্রাগুক্ত, ৪২১

২৮১. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

তুলেছেন। আল-জাহিয এমন এক অলঙ্কার বিজ্ঞানী যে, পরবর্তী বহু অলঙ্কারবিদ তাঁর অনুসরণে গবেষণা করে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রেখে গেছেন।[২৮২]

ইবন কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারী (মৃ. ২৭৬ হি./ ৮৮৯খ্রি.)

প্রকৃত নাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুসলিম আদ-দীনাওয়ারী আল-কুফী। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মশহুর আলিম ছিলেন তিনি । পূর্ব পুরুষের বাসস্থান ইরানের খোরাসান। তিনি ২১৩ হি./৮২৮খ্রি. কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন।[২৮৩]তাঁর মাতৃকুল বসরায় বসবাস করতেন অতঃপরতারা আব্বাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইরাকে বসবাস করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যারা সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম, ধর্মতত্ত্ববিদ, হাদিস বিশারদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে সুপরিচিত।এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন রাহওয়াইহ আল- হাসজালী (মৃ. ২৩৭/৮৫১খ্রি.),আবু হাতিম সাহল ইব্ন মুহাম্মদ আস-সিজিস্তানী (মৃ. ২৫০ হি./ ৮৬৪খ্রি.),আল-আব্বাস ইবনুল ফারাজ আর-রিয়াশী (মৃ. ২৫০ হি./৮৭১খ্রি.) প্রমূখ। এঁদের প্রথম জন ছিলেন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর ছাত্র। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন। নিশাপুরের তাহিরী বংশীয় শাসনগণ তাঁর অনুরক্তছিল । ফলে তাদের থেকে তিনি অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ সুন্নী আলিম । ভাষাতত্ত্ব ও হাদীস শাস্ত্রে তিনি অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ইরাকের এ বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রায় সকলেরই তিনি উস্তায ছিলেন। তৃতীয় জনও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ইরানের

---

২৮২. প্রাগুক্ত, ১৯

২৮৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৮

জমিনে রাহনুমাদের অন্যতম ছিলেন। ইব্ন কুতাইবা আল-আসমায়ী,আবু উবায়দা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদদের রচনা সংরক্ষণ করেছিলেন।[২৮৪]

ইব্ন কুতাইবা খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক সমাদৃত হন। এক্ষেত্রে উযীর আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহইয়াহ ইব্ন খাকানের সুনজর নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। তিনি তাঁকে একটি সরকারি পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁরই সহযোগিতায় ২৩৬ হি./৮৫১ খ্রি. দীনাওয়ারের কাযী পদে তিনি নিযুক্ত হন।২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি. পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। অতঃপর তিনি বসরার 'মাজালিসে'র পরিদর্শক পদের কিছুকাল কাজ করেন। বাগদাদের তাহেরী শাসকদের সাথেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল।[২৮৫] ২৫৭ হি./৮৭১ খ্রিস্টাব্দেরপর তিনি বাগদাদের একটি জেলাতে নিজের রচিত গ্রন্থাবলী শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কাজেই তিনি ব্যস্ত থাকেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে তদীয় পুত্র আহমাদ ইব্ন কুতাইবা, কাসিম ইব্ন আসবাগ,উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদির রহমান আস-সুক্কারী, আবু আব্দিল্লাহ ইব্ন জাফর ইব্ন দুরুসতাওয়াহ,ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আইয়ুব আস-সাইগ প্রমূখ।

ইব্ন কুতাইবার ১৫টি গ্রন্থ বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১। কিতাব আদাবিল কাতিব।

২। কিতাবুল আসওয়া

৩। কিতাবুল 'আরাব

৪। কিতাবুল আশরিবা

---

২৮৪. প্রাগুক্ত
২৮৫. প্রাগুক্ত

৫। কিতাবুল ইখতিলাফ ফিললাফজ ওয়াররাদ্দ আলাল জাহামিয়া ওয়াল মুশাব্বিহা

৬। কিতাবুল মা'আনিশশি'র

৭। কিতাবুল মা'আরিক

৮। কিতাবুল মাসাঈল ওয়াল আজবিবা

৯। কিতাবুল মাইসির ওয়াল ফিদাঈ

১০। কিতাবুল শি'র ওয়াশ শু'আরা

১১। কিতাবু তাফসীরি গারীবিল কুরআন

১২। কিতাবু তাবীল মুখতালিফিল হাদীস

১৩। কিতাবু তাবীল মুশকীলিল কুরআন

১৪। কিতাবু উয়ূনিল আখবার

১৫। কিতাবু গারীবীল হাদীস।

উল্লেখ্য 'কিতাবু তাবীল মুশকিলিল কুরআন' গ্রন্থটি ইলমুল বালাগাত বিষয়ক রচনা। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের শব্দ ও বাক্যের অলঙ্কার ও ই'জাযুল কুরআন বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থিত করেছেন।[২৮৬]এছাড়া তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্ব বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন। সেই সাথে সমালোচকদের বিভিন্ন সমালোচনার যথার্থ জবাব প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থে حقيقة، مجاز، استعارة، كناية ইত্যাদি বিষয়ে ইলমুল বয়ানের আলোকে আলোচনা পেশ করে।[২৮৭]

আবুল আব্বাস আল মুবাররিদ (মৃ.২৮৫ হি./ ৮৯৮খ্রি.)

আবুল আব্বাস আল-মুবাররিদ স্বীয় যুগের অন্যতম প্রতিভাধর মনীষী ছিলেন। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উন্নয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ভাষাতত্ত্বেও ইতিহাসে

---

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

২৮৭ . ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর অন্যতম অবদান হচ্ছে الكامل নামক গ্রন্থ প্রণয়ন । এতে তিনি অপরিচিত পদ্য ও গদ্যের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পেশ করেন। এ গ্রন্থে তিনি আরবী অলঙ্কারের বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। তিনি تشبيه কে চারভাগে বিভক্ত করেন।

যথা:

(১) تشبيه مفرط

(২) تشبيه مصيب

(৩) تشبيه مقارب

(৪) تشبيه بعيد

এ ছাড়া তিনি استعارة، مجاز ও كنايةবিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন।[২৮৮]

আব্দুল্লাহ ইব্ন আল মুতাজ (মৃ. ২৯৬হি./৯০৮খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম আবুল আব্বাস ইবনুল মু'তাজ। তিনি ২৪৭ হি./৮৬১ খ্রি. জন্ম গ্রহন করেন। তিনি আব্বসী খলীফা আল-মু'তায এর পুত্র। তিনি আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ আস-সালাবীসহ সমকালীন খ্যাতিমান মনীষীদের নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন। তাছাড়া বিশদ্ধভাষী বেদুইনদের সাথেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি তাদের থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন।রাজকীয় ক্ষমতা ও কার্যক্রমের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি কবি সাহিত্যিকদের সাহচর্যকে রাজদরবারের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। খলীফা আল-মুতাদিদ ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। খলীফার দরবারে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মান ছিল।[২৮৯] কিন্তু এক সময় খলীফা হলেন আল-মুকতাফী। কিন্তু কিছু সংখ্যক অমাত্য তাকে পছন্দ করতেন না। তারা তাকে

---

২৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২৮৯.সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭

পদচ্যুত করে ইবনুল মু'তাযকে খলীফা ঘোষণা করেন। তিনি মাত্র একদিন খলীফার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর আত্মগোপন করতে বাধ্য হন এবং বন্দী হয়ে মুনিস নামক একজন ক্রীতদাস কর্তৃক শাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনুল 'মুতায আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে গণ্য। তিনি স্বীয় যুগের আরবী কবিতা ও সাহিত্যে অতুলনীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত । তাঁর দীওয়ান সর্বপ্রথম আবুবকর মুহাম্মাদ ইয়াহইয়াহ আস-সুলী (মৃ. ৩৫৩/৯৪৬খ্রি.) কর্তৃক বিন্যস্ত ও গ্রন্থস্ত করা হয়। তিনি তাঁর কবিতাগুলোকে বিশ ভাগে বিভক্ত করে দেন এবং কবিতার অন্তমিল আরবী বর্ণমালা অনুসারে বিন্যস্ত করেন।আরবি অলঙ্কার শাস্ত্রে ইবনুল মু'তাযের গুরুত্বপূর্ণ আবদান হচ্ছে 'কিতাবুল বাদায়ী'। উক্ত গ্রন্থে তিনি علم البديعবিষয়ে আলোকপাত করেছেন।[২৯০] যদিও علم البديعতাঁর পূর্বেও আলোচিত হয়েছে তথাপি এ বিষয়ে কেউ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে অবিস্বরণীয় হয়ে আছেন।[২৯১]

এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার পূর্বে কেউ علم البديعএর সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেননি এবং আমার সমসামায়িক কালেও এসমস্ত বিষয়ে কেউ আমাকে অতিক্রম করতে পারেননি, তবে পরবর্তীতে আমাকে অতিক্রম করে অধিক বিষয় সন্নিবেশিত করতে চাইলে তাঁর স্বাধীনতা আছে।"[২৯২]

উপর্যুক্ত গ্রন্থে ইবনুল মু'তায ১৯টি বিষয়ের অবতারণা করে তার পৃথক পৃথক নামকরণও করেন।প্রথমে তিনি ৬টি পরিভাষার আলোচনা করেন। এগুলো হচ্ছে:

১)الإستعارة

---

২৯০. প্রাগুক্ত, ৬৩৮

২৯১. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২) التجنيس

৩) المطابقة

4) الطباق

৫) الإعجاز على ما تقدمها

৬) المذهب الكلامى

এগুলো তিনি আরবী অলঙ্কারের মৌল বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। অত:পর আরো ১৩টি বিষয়ের নামকরন করে এর সংজ্ঞা প্রদান করেন। এগুলো হচ্ছেঃ

১) الإلتفات

২) الإعتراض

৩) الرجوع

8) الخروج إلى معنى إلى معنى

৫) تاكيد المدح بما يشبه الذم

৬) تجاهل العارف

৭) الهزل يراد به الجد

৮)التضمين

৯) التعريض والكناية

১০) الإفراطفي الصفة

১১) حسن التشبيه

১২) اعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك ليس له

১৩) حسن الإبتداء

কুদামা ইব্ন জাফর (মৃ.৩৩৭ হি./৯৪৮খ্রি.)

কুদামা ইব্ন জাফর স্বীয় যুগের অনন্য প্রতিভাধর মনীষী হিসেবে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি‘ইলমুন নাকদ’ শাস্ত্রে অনন্য অবদান রাখেন। সেই সাথে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রেও তিনি যথেষ্ট অবদান রাখেন। علم البديعএর ১৮টি পরিভাষার নামকরণ করেন তিনি। এর বেশ কয়েকটি ইবনুল মু‘তাজের সাথে মিল রয়েছে আবার কয়েকটির সাথে মিল নেই। যেগুলোর সাথে গড়মিল রয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

(১) الترميع

(২) صحة التقسيم

(৩) صحة المقالبلات

(৪) صحة التفسير

(৫) التتميمবলে الأغراضএর নামকরণ করেন।

(৬) الإشارة

(৭)الإرداف

(৮) التمثيلএকে পরবর্তীতে المائلة

বলে নামকরণ করা হয়।

(৯) المطابق পরবর্তীতে এটিকে المعطف বলে নামকরণ করা হয়।

(১০)التوشيح এটিকে ইব্নুল মু‘তায رد الإعجاز على ما تقدمها من الكلام বলে নামকরণ করেন।

(১১) الإبغال

(১২) التكأفؤ একে ইবনুল মু‘তায الطباق বলে নামকরণ করেন।

(১৩) الغلو।[২৯৩]

আর-রুমানী (মৃ. ৩৮৬ হি./৯৯৬ খ্রি.)

আবুল হাসান আর-রুমানী আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম النقد في إعجاز القران। তিনি এ গ্রন্থটি ১০টি অধ্যায় রচনা করেন। এর মধ্যে দু'টি অধ্যায়ে শুধু علم البيان সম্পর্কেই আলোচনা করেন। তিনি تشبيه কে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।[২৯৪]

আবু হিলাল আল-আসকারী (মৃ.৩৯৫ হি./ ১০০৪ খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম আবু হিলাল আল-হাসান ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন সাহল। তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।[২৯৫] তিনি আবু আহমাদ আল-হাসান ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল-আসকারী (২৯৩-৩৮২ হি.)-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ:

১. জামহারাতুল আমছাল। এটি একটি প্রবাদ বাক্য সংকলন।এটি কায়রো থেকে ১৩১০ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া মুম্বাই থেকে ১৩০৬-১৩০৭ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

২. কিতাবুল-ফুরুকিল-লুগাবিয়্যাহ। এটি সমার্থক শব্দাবলীবিষয়ক গ্রন্থ। এটি কায়রো থেকে ১৩৫৩ হি. প্রকাশিত হয়।

৩. আল-মু'জাম ফি বাক্বিয়াতিল-আশয়া।এটি কায়রো থেকে ১৩৫৩হি. সনে প্রকাশিত হয়।

---

২৯৩ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৯৪. প্রাগুক্ত

২৯৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৯৮

৪. আল-আসকারীর আরবী ভাষাতত্ত্বে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো কিতাবুস-সনা'আতাইন আল-কিতাবা ওয়াশ-শি'র। গ্রন্থটি ইস্তম্বুল থেকে ১৩২০ হিজরী ও কায়রো থেকে ১৯৫২খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি অলঙ্কার শাস্ত্রের সুবিন্যস্ত সার গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।[২৯৬] ৫২৮ পৃষ্ঠার একটি সুবৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে এটি বোদ্ধা মহলে বিশেষ পরিচিত। গ্রন্থটিকে ১০টি অধ্যায় ও ৫৩ টি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে:

১. معرفة صنعة الكلام

২. تميز الكلام من رديئه

৩. إبانة الكلام عن موضوع البلاغة وحدودها

৪. ذكر الإيجاز والإطناب

৫. البيان عن حسن النظم وجودة الرصف

৬. ديوان المعانى

এটি ও কায়রো থেকে ১৯৫২ খ্রি. প্রাশিত হয়। এটি কাব্য তথা পদ্যে-ব্যবহৃত মার্জিত ও মৌলিক ভাবধারায় পুষ্ঠ অভি ব্যক্তি সমূহের একটি সংকোলন।

৭. ترتيب الألفاظ

৮. مهاسل المعانى

এটি পবিত্র কুরানের তাফসির। এতে তিনি পবিত্র কুরআনেরঅনন্য সমীকরণ ভাষাশৈলীঃ সৌন্দর্য বিষয়ে আলোক পাত করেছেন।

৯. حسن الأخذ وحل المنظوم

১০. التشبيح

---

২৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৮

১১. ذكر الإسجاع والإزدواج

১২. شرح البديع

১৩. ذكر المبادى الكلام ومقاطعة

আল-উতবী

তাঁর প্রকৃত নাম আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-জাব্বার। তিনি আনুমানিক ৩৫০ হি./৯৬১ খ্রি. রায়ে জন্মগ্রহণ করেন।[২৯৭] তাঁর শৈশব সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। তাঁর মামা তখন আবু নাসের আল-উতবী খোরাসানে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখানে গমন করেন।

তিনি খোরাসানের সেনা প্রধান আবু সীমজুরীর অধীনে কিছু কাল চাকুরী করেন অতঃপর শামসুল সাআলী কাবসের অধীনে কিছুকাল চাকুরী করেন। গজনী অধিপতি সবুক্তগীনের অধীনে তিনি সচিব পদে কিছুকাল চাকুরী করেন। একই পদে ইসমাঈল ইবন সবুক্তগীনের অধীনেও তিনি কিছু কাল কাজ করেন। অতঃপর তিনি সুলতান মাহমুদ গযনভীর সাথে যুক্ত হন। সুলতান মাহমুদ তাঁকে ৩৮৯হি. /৯৯৯ খ্রি. গারশিস্তানে বিশেষ দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।তিনি সেখানে গিয়ে গারশিস্তানের শাসন কর্তাকে বশ্যতা স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করেন এবং কৃতকার্য হন। এ সময় অর্থাৎ ৪১২হি./১০২১খ্রি. আল-উতবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল ইয়ামানী সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি তিনি সুলতান মাহমুদের উযীর শামসুল কুফাত আহমাদ ইবন হাসান আল-মায়মানদীকে উপহার দেন। পুরস্কার স্বরূপ উযীর আহমাদ তাঁকে কানজ রুস্তাক এর সাহিব-ই-বারীদ বা প্রধান পোস্ট মাস্টারের দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু সেখানে গভর্নর আবুল হাসান আল-বাগাবীর সাথে তার মনোমলিন্য হয় এবং তিনি ৪১৩হি./ ১০২২খ্রি. চাকরিচ্যুত হন। অতঃপর তিনি যুবরাজ

---

২৯৭ . সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৬, পৃ.৮৭

মাসউদের অধীনে কিছু কাল চাকুরী করেন। ৪২৭/১০৩৬ মতান্তরে ৪৩১/১০৪০ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২৯৮]

আল-উতবী বহু গ্রন্থ প্রনয়ণ করলেও কালের গর্ভে সব হারিয়ে গেছে একমাত্র আল-ইয়ামানী সংরক্ষিত হয়েছে। এগ্রন্থে তিনি আমীর সবুক্তগীন, সুলতান মাহমুদ ও তার সমসাময়িক রাজ-রাজাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।এর রচনা শৈলী উন্নত অলঙ্কার মন্ডিত। সর্বযুগে এর একটি বিশেষ মর্যাদা লক্ষ্য করা যায়। জুরজী যায়দান এর রচনা শৈলীকে আস-সালাবীর 'ইয়াতীমার' চেয়েও উৎকৃষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন।[২৯৯]

আল-হাসান ইব্ন রশীক আল-কায়রোয়ানী (মৃ.৪৬৩ হি./১০৭০খ্রি.)

প্রকৃত নাম আবু আলী আল-হাসান ইব্ন রশীক আল-কায়রোয়ানী আল-মাসিলী আল-ইফরীকী। তিনি ৩৯০হি./১০০০খ্রি. কনস্টান্টিনোপলের মুহাম্মাদিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রশীক সম্ভবত রোমান ক্রীতদাসছিলেন। অতঃপর মুক্তিলাভ করে আযদ গোত্রের মিত্রতা গ্রহণ করেন এবং মাসিলায় স্বর্ণকারের ব্যবসা করতে থাকেন। মাসিলায় ইব্ন রশীকের শৈশব কাটে। এখানেই তিনি প্রাথমিক পাঠ শেষ করেন এবং তাঁর কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্যানুরাগের উন্মেষ ঘটে।অতঃপর তিনি ৪০৬ হি./ ১০১৫ খ্রি. তৎকালীন আফ্রিকার রাজধানী ও সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি কেন্দ্র কায়রোয়ানে গমন করেন। সেখানে তাঁর স্বদেশী আন-নাহশালীর মাধ্যমে কায়রোয়ানের সাহিত্যিক গোষ্ঠির অন্যতম বাক্তি আল-খুশানী আল-কায্যায ও ইবরাহীম আল-হুরসীর সানে সাক্ষ্য লাভ করেন এবং তাদেরনিকট শিক্ষালাভের সুযোগ পান। ৪১০হি./১০১৯খ্রি.সুলতান আল-মুইয্য এর গৃহ শিক্ষক, প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও জ্যামিতিবিদ ইব্ন আবির রিজালের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। ইব্ন আবির রিজাল রাজকীয় যীরি সরকারী

২৯৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৮৭
২৯৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৮৭

নিবন্ধকের দফতরের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর সহায়তায় ইব্ন রশীক সেখানে একটি চাকুরী লাভ করেন।[৩০০]

ইব্ন রশীক বহু গ্রন্থ রচনা করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে গ্রন্থ كتاب العمدة في صناعة الشعر ও النقد প্রণয়ন। এটি একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে তিনি পূর্ববর্তী অলঙ্কারবিদগণের علم البديع ও علم البيان বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সন্নিবেশিত করেন।[৩০১]

ইব্ন সিনান আল-খুফাজী (মৃ. ৪৬৬হি./ ১০৭৩ খ্রি.)

ইব্ন সিনান আল-খুফাজী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ইলমুল বালাগাত বিষয়ে كتاب سر الصناعة নামে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত বালাগাত বিষয়ে আলোকপাত করেন। সেই সাথে ফাসাহাত ও বালাগাতের মধ্যে পার্থক্য এবং উচ্চমান ও নিম্নমানের বক্তব্যের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রয়েছে তা তিনি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তিনি বহু আলোচনার পর এটি প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি বালাগাত পূর্ণ বাক্য نصيح হওয়া শর্ত, তবে প্রতিটি ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে بليغ হতে হবে না অর্থাৎ بليغ হওয়া শর্ত নয়। উপর্যুক্ত গ্রন্থে তিনি লেখার মূলনীতি বিষয়েও আলোচনা করেছেন। প্রথম মূলনীতিতে তিনি حقيقة، مجاز، تقديم، تأخير ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় মূলনীতিতে শব্দের সঙ্গে শব্দের সাদৃশ্য বিষয়ক আলোচনা পেশকরেছেন। পরবর্তী যুগের অলঙ্কারবিদগণ একে مراعاة النظير নামে নামকরণ করেছেন। তাঁর আরেকটি মত হচ্ছে বাক্য তৈরির সময় শব্দের পরস্পরা

---

৩০০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ , খ. ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫

৩০১. প্রাগুক্ত

বজায় রাখা অতীব জরুরি। এটিকে পরবর্তী অলঙ্কারবিদগণ اللف والنشر বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩০২]

আব্দুল কাহির আল-জুরজানী (মৃ. ৪৭১ হি./১০৭৮খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম আবু বকর আব্দুল কাহির ইব্ন আবদুর রহমান আল-জুরজানী।[৩০৩] বহু মুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা জুরজানী আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর দু'টি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এরএকটি হচ্ছে دلائل الإعجاز। এতে علم المعانى বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি اسرار البلاغة । এ গ্রন্থটিতে علم البيان বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। البلاغة علمতিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম অর্থাৎ علم البديع، علم المعانى، علم البيان এর সমন্বয়ে গঠিত علم البلاغة -এটি তিনিই সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন। সমকালে আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁকে দিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীতেও তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। এ জন্য علم المعانى ওعلم البيان এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তাঁকেই বলা হয়ে থাকে।[৩০৪]

আল্লামা জুরজানী পূর্ববর্তী অলঙ্কারবিদদের আলোচনা সমূহ পর্যালোচনা করে علم المعانى বিষয়ে নিয়মনীতিসমূহ উদ্ভাবন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত নিয়মনীতিসমূহ সর্বজন স্বীকৃত হয়। এমনকি তাঁর পরবর্তী যুগেও এ বিষয়ে কোনোপন্ডিত ব্যক্তি নতুন আবিষ্কার ও সুক্ষ আলোচনায় তাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি।[৩০৫]

---

৩০২. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

৩০৩. আসরারুল- বালাগাহ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৩

৩০৪. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩০৫. প্রাগুক্ত

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হি./১১৪৩ খ্রি.)

তিনি মুতাযিলী আলিম ছিলেন। ভাষাতত্ত্বসহ বহুমুখী জ্ঞান-গরিমার অধিকারী ছিলেন এই মনীষী। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে তার লিখিত গ্রন্থ হচ্ছে- أساس البلاغة। এটি এ শাস্ত্রের শক্তিশালী প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ আল-কাশশাফে এ সম্পর্কীত নিয়মনীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

উসামা ইবন মুনাকিয (মৃ. ৫৮৪ হি./ ১১৮৮খ্রি.)

আল্লামা উসামা ইব্ন মুনকিয علم البديع এর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে এ শাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। গ্রন্থটির নাম হচ্ছে البديع في نقد الشعر। এ গ্রন্থে তিনি علم البديعসম্পর্কীত ৯৫টি পরিভাষা সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেন।[৩০৬]

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬হি./১২০৯ খ্রি)

তাঁর প্রকৃত নাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ওমর ইব্ন আল-হোসাইন আত-তাইমী আল-বাকরী আত-তায়ী। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী নামেই তিনি সমাধিক পরিচিত। তিনি ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইরানের মাজান্দারান প্রদেশের আমলনামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২০৯ খ্রি. তিনি হিরাতে মুত্যবরণ করেন।[৩০৭]বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আল্লামা রাযী। ইসলামী সুফীতত্ত্বে তাঁর অনবদ্য অবদান অনস্বীকার্য। তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর সেরা অবদান হচ্ছে مفاتح الغيب নামক

---

৩০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

৩০৭. *উইকিপিডিয়া*

তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন যা التفسير الكبيرনামে সমধিক পরিচিত। এ গ্রন্থে তিনি ইলমুল বালাগাত বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন।

বালাগাত শাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম হচ্ছে, كتاب الإيجاز في دراية الإعجاز গ্রন্থটি আকারে ছোট হলেও এতে তিনি বালাগাত শাস্ত্রের পরিভাষাগুলো সুবিন্যস্তভাবে একত্রিত করেছেন। আল্লামা আব্দুর কাহির জুরজানীরপরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত বালাগাত বিষয়ক আলোচনাই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।[৩০৮]

আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইব্ন আস-সাকাকী (মৃ.৬২৬হি./ ১২২৮খ্রি.)

আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইব্ন আস-সাকাকীছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম। অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষসম। ইলমুল বালাগাত শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে مفتاح العلومনামক অনন্য সাধারণ প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন। এ গ্রন্থে তিনি পূর্ববর্তী অলঙ্কারবিদদের আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে সুক্ষ্মবাতসুক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি তিনি তিনটি ভাগে বিভক্ত করে প্রথম অংশে علم الصرفদ্বিতীয়াংশে علم النحوএবং তৃতীয়াংশে علم المعانىও علم البديعবিষয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর এ কিতাবের শেষাংশে তিনি فصاحةও بلاغةসম্পর্কে আরো একটি অধ্যায় একত্রিত করেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তীদের অনুসরণ না করে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ গ্রন্থে তিনি علم البلاغة ও علم البيانএ দু'টি প্রামাণ্য সংজ্ঞাও প্রদান করেন।[৩০৯]

---

৩০৮. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩০৯.প্রাগুক্ত

গ্রন্থটি সুধী মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। গ্রন্থটির বেশ কিছু ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণীত হয়। এর মধ্যে অন্যতমসেরা ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে تلخيص المفتاح। এটি রচনা করেছেন কাযী আবু আব্দিল্লাহ জালালুদ্দীন ইব্ন আব্দুর রহমান আল কাযবীণী(৬৬০-৭৩৯হি.)। এটি মূলত تلخيص المفتاحমূল গ্রন্থের তৃতীয়াংশের ব্যাখ্যা। আবার تلخيص المفتاحএর ব্যাখ্যা গ্রন্থও খ্যাতি লাভ করে। এ ক্ষেত্রে مختصر المعانىএর নাম প্রণিধান যোগ্য।[৩১০] আল্লাম সাকাকী علم المعانىকে ৮ভাগে বিভক্ত করেন। যথা:

১। الخبر والطلب

২। الإسناد الخبرى واختلافه بإختلاف السامع من حيث خلو الذهن أو الشك او الإنكار

৩। الإسناد، بيان أحوال المسند إليه والمسند

৪। الفعل ومتعلقاته

৫। الفصل والوصل

৬। الإيجاز والإطناب ، وبيان كيف أنهما نسبيان

৭। القصر وأنوائه وطرقه

৮। الطلب وما يندرج تحته

আল্লাম সাকাকী অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কথা বলার নিয়মনীতিকে علم المعانىএকটি বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনাকরার নিয়মনীতিকে علم البيان এবং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী সৌন্দর্য়মন্ডিত বাক্য বলার নিয়মনীতিকে علم البديعবলেআখ্যায়িত করেছেন।[৩১১]

৩১০.মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৩১১. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

যিয়াউদ্দিন ইবনুল আসীর (মৃ.৬৩৮ হি./ ১২৪০ খ্রি.)

তাঁর প্রকৃত নাম যিয়াউদ্দিন আবুল ফাতহ নাসরুল্লাহ। পিতার নাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল কারীম।তিনি ৫৫৮হি./১১৬৩খ্রি. মাওসীলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওসীলের জঙ্গী বংশীয় শাসকদের অধীনে পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁরা তিন ভাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন। যিয়াউদ্দিন ইবনুল আসীর ৫৮৩ হি. ১১৮৭ সালে মুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বাহিনীতে যোগদান করেন। ১১৯১ সালে তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বিভিন্নকার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সালাহুদ্দীনেরপুত্র আল-আফদালের সাথে যুক্ত হন। সুলতান সালাহুদ্দীন ইন্তিকাল করলে তিনি আল-আফদালের উযীর মনোনীত হন। এরপর তিনি আরসালান শাহ, আল আফদাল আল-মালিকুজ জাহির গাজীর অধীনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন স্থানে বসবাসের পর ৬১৮হি./১২২১ খ্রি.মাওসীলে বসবাস করতে থাকেন। এসময় তিনি মাহমুদ ইব্ন মাসউদ ইব্ন আরসালান শাহ ও বদরুদ্দীন লুলুর অধীনে 'কাতিবুল ইনশা' পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর বাগদাদে একটি দৌত্যকার্যে যাওয়ার পথে ৬৩৭ হি./১২৩৯ খ্রি.মৃত্যুবরণ করেন।[৩১২] যিয়াউদ্দিন ইবনুল আসীরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে:

১। আল-ওয়াশিউল মারকুম,বৈরুত থেকে এটি ১২৯৮ হি. সনে প্রকাশিত হয়।

২। আল-জামিউল কাবীর , এটি মুস্তাফা জাওয়াদ ও জামীল সাঈদের সম্পাদনায় বাগদাদ থেকে ১৩৭৫ হি./১৯৫৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

৩। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر এটি বনক্রেমারের সম্পাদনায় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।এ গ্রন্থে তিনি أمثال، علم اللغة، بلاغة،

৩১২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৬৮-৫৬৯

فصاحة ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন। সেই সাথে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও আলোচনা করেন।[৩১৩]

শরফুদ্দীন আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আত-তিফাশী আল-মাগরিবী (মৃ.৬৫১ হি./১২৫৩ খ্রি.)

আল্লামাশরফুদ্দীন আহমাদআত-তিফাশী আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্যতম একজন দিকপাল ছিলেন। علم البديع এর একটি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি।এতে তিনি محسنات البديع এর উপর ৭০টি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেন।[৩১৪]

রুকনুদ্দীন আবদুল আযীম ইব্ন আবীল ইসবা আল-মিসরী (মৃ.৬৫৪ হি./১২৫৬খ্রি.)

তিনি হিজরী সপ্তম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। علم البديع বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি।এরএকটি হচ্ছে تحرير التحرير অন্যটি بديع القران । تحرير التحريرগ্রন্থে তিনি محسنات البديع এর ১২২টি পরিভাষা উপস্থাপন করে বিষদ আলোচনা করেন।এ ১২২টি পরিভাষার মধ্য থেকে নিজের উদ্ভাবিত ৩০টি পরিভাষা এবং পূর্ববর্তী অলঙ্কারবিদদেরউদ্ভাবিত ৯২টি পরিভাষা স্থান পায়। এ বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ بديع القران এ পবিত্র কুরআনের ১০৮টি আয়াতেকারীমা উল্লেখ করে এগুলোর সাথে محسنات البديع এর সম্পর্ক আলোচনা করেন।[৩১৫]

---

৩১৩. ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩১৪ . ড. মু.নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকার বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩১৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আরব বিশ্বে কালজয়ী আদর্শ ইসলামের আগমনের পূর্বেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইসলামের আগমনের সাথে সাথে আরবী সাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কেননা তখন এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ হয় যা সকল কবি, সাহিত্যিক ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গকে হতবাক করে দেয়। পবিত্র কুরআনের অনুপম রচনাশৈলী আরবদের অক্ষম করে দেয়। বহু চেষ্টা সাধনা করেও তারা পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি, এমনকি এক সময় তারা পবিত্র কুরআনের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

পবিত্র কুরআন আরবী ভাষা ও সাহিত্য জগতে এক বিপ্লব নিয়ে আসে। কবি-সাহিত্যিকদের মনোজগতে বিরাট পরিবর্তন আসে। আরবী সাহিত্য এক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। পবিত্র কুরআনকে আশ্রয় করে নতুন নতুন শাস্ত্র আবিষ্কার হতে থাকে। এরই ধারাবাহিতায় আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ জন্য বহু সময় অপেক্ষা করতে হয়। কেননা, এ জন্য বহু মনীষীর ত্যাগ ও সাধনার ফলশ্রুতিতে শাস্ত্রটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উল্লেখ্য, এর বীজ রোপন করা হয় জাহিলী যুগে এরপর ক্রমান্বয়ে এটি পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়। এ ক্ষেত্রে একদল নিবেদিতপ্রাণ মনীষী স্ব স্ব যুগে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে প্রতিযুগের এ কাজে ব্যাপৃত মহান মনীষীদের কর্মসমূহের তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আব্বাসী শাসকদের মধ্যে এমন কয়েকজন শাসক ছিলেন যাঁরা শুধু শক্তিশালী নৃপতিই ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পৃষ্টপোষক। এদের মধ্য থেকে খলীফা হারুনুর রশীদ (৭৬৫-৮০৮খ্রি.) ও তদীয় পুত্র মামুনুর রশীদের (৭৮৬-৮৩৩) নাম প্রণিধানযোগ্য। খলীফা হারুনুর রশীদ বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন আর এর মধ্য দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাঁর শাসনামলে বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়। তাঁর রাজধানী বাগদাদ ছিল স্বপ্ন নগরী। কাব্য, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, সংগীত প্রভৃতির চর্চার জন্য এ নগরী ছিল আদর্শ শহর।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা মামুন পিতার মতোই বিদ্যেৎসাহী ছিলেন। মামুন এরিস্টটলসহ অন্যান্য পণ্ডিতদের পুস্তকাদির অনুবাদকল্পে রোমান সম্রাটকে নির্দেশ দিলে তিনি পাঁচটি উট বোঝাই করে দর্শনের বই-পত্র পাঠিয়ে দেন। মামুন বিশিষ্ট পণ্ডিত ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক আল-কিন্দিকে গ্রন্থগুলোর অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়নের কারণে মামুনের দরবারে দূর-দূরান্ত থেকে পণ্ডিত ব্যক্তি বর্গ ভীড় জমাতে থাকেন। তিনি তাঁদের উচ্চ বেতন নির্ধারণ করেন। বাইতুল হিকমার পণ্ডিতদের এক একজনের বেতন ছিল আড়াই হাজার মুদ্রা। তাঁর দরবার যারা আলোকিত করেছেন তাদের মধ্যে হুনাইন ইব্ন ইসহাক, কাস্তা ইব্ন লুক বা'লাবাক্কী, আবু জাফর ইয়াহিয়া ইব্ন আদী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসা আল-খাওয়ারেজমী, খালিদ ইব্ন আদুল মালিকের নাম প্রণিধানযোগ্য।

আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রও প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এমনকি এ শাস্ত্রটি এ যুগেই পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়। আব্বাসী যুগের আরবী অলঙ্কারবিদদের এ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠায় সীমাহীন পরিশ্রম ও গবেষণা এ অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, নানাবিদ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ অভিসন্দর্ভটি পাঠ করলে বিদগ্ধ পাঠক আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষত এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এবং আব্বাসী যুগে এর শাস্ত্রীয় উৎকর্ষ লাভ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করবে-ইনশাআল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। আল-কুরআনুল কারীম।

২। অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণ (কলিকাতা: বাণী মঞ্জিল, ১৯৭৬ খ্রি.)।

৩। আলী (রা.), *দিওয়ান-ই-আলী (রা.)* (ঢাকা : র‍্যামন পালিশার্স, ২০০২ খ্রি.)।

৪। আব্দুল কাহির জুরজানী, *আসরারুল- বালাগাহ* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮ খ্রি.)।

৫। আবু তাহের মেসবাহ, আত-তারীকু ইলাল বালাগাহ (ঢাকা: দারুল কলম, ১৯৯৮ খ্রি.)।

৬। আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যেও ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাধেশ, ২০০৩ খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ।

৭। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, আল-আগানী (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.)।

৮। আবদুল আযীম আয-যারকানী, মানাহিলুল ইরফান (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলুময়্যাহ, ১৯৭৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড।

৯। ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.)।

১০। মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা (ঢাকা: বাংলাধেম মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯ খি.)।

Dhaka University Institutional Repository

১১। মাসঊদ ইব্ন ওমর সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, অনু. মুহাম্মদ আবূ বকর কাসেমী, মুখতাসারুল মা'আনী (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.)।

১২। মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনু.মাওলানা আব্দুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

১৩। মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সব-উল মুঅল্লকাত (ঢাকা: কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, তা.বি)।

১৪। মুহাম্মদ তাকী উসমানী, উলুমুল কুরআন (দেওবন্দ: কুতুব খানা নামিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.)।

১৫। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বখারী, সহীহ বুখারী, কারখানা তেজারতে কুতুব, ১৯৬১ খ্রি.)।

১৬। ড. মু.নকিবুল্লঅহ, আরবী অলংকার বিজ্ঞান(রাজশাহী: সাফিউল্লাহ, ২০১৪ খ্রি.)।

১৭। ড. মোঃ গোলাম মাওলা, আল-কুরআনুল কারীম-এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য (ঢাকা: ই. ফা. বা. ২০০৫ খ্রি.)।

১৮। ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলণ (চট্গ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৯ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

১৯। ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাধেশ, ২০০৩ খ্রি.)।

২০। ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী: আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০১ খ্রি.)।

২১। ২২. ড. আবদুল জলীল, *কবি ও কবিতা স্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব* (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.)।

২২. ড. শাওকী দায়ফ, *তারীকুল আদাবিল আরাবী*, ২য় খণ্ড, ১৪শ সংস্করণ।

২৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫), ৪র্থ সংস্করণ।

২৪। জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ (বৈরুত: মানশুরাতু দারি মাকতাবতিল হায়াহ, ১৯৯২ খ্রি.)।

২৫। জালালুদ্দীন সূয়ূতী, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন* (মিশর: মোস্তফা আল বাবী আল-হালাবী, ১৯০১ খ্রি.) খ. ১, ২য় প্রকাশ

২৬। হাফনী বেগ নাসিফ, অনু. এাহমুদ হাসান কাসেমী ও আবুল কালাম মাসুম, দুরুসুল বালাগাত (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.)

২৫। হাফেজ মনির উদ্দিন আগমদ, কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ (ঢাকা: আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন, তা. বি.)।

২৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ, ১।

২৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২।

২৯। সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩।

৩০। সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪।

৩১। সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১১।